স্বস্তিকা

দাম : সাত টাকা
৬৪ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।।
৪ জুন - ২০১২।।
২১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৯।।

জলদূষণ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

দেশকে বিদেশী বণিকদের কাছে বেচে দিতে চাইছে কংগ্রেস □ ৯

পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের লক্ষ্য : সিপিএমকে স্তব্ধ করা ও কংগ্রেসীদের তৃণমূলে আনা □ ১০

খোলা চিঠি : হাততালি দিন, 'মাওবাদী' প্রশ্ন করবেন না □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

৩৪ বছর বনাম ১ বছর : বামেদের সঙ্গে মমতার পার্থক্য কতটা? □ সাধন কুমার পাল □ ১২

জল নিয়ে যন্ত্রণা □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৪

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুণ্যজীবন কথা □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২১

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা □ সংকর্ষণ মাইতি □ ২২

ইমামদের হামাম খরচ জোগাবে তামাম হিন্দু সমাজ? □ শিবাজী গুপ্ত □ ২৭

প্রবহমান নদীস্রোত মানসিক শক্তি যোগান দেয় □ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা □ ২৮

মালদার সীমান্তে বাংলাদেশী সিমকার্ডের ব্যাপক চোরাকারবার চলছে □ ৩১

জলের জন্য হাহাকার : মহারাষ্ট্রের ১৫টি জেলার ১০ হাজার গ্রাম খরার কবলে □ ৩২

বেরসিক গোমড়ামুখেও অবলীলায় হাসি ফোটাতে পারে কার্টুন □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৬

স্মরণে : প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় □ দেবাদিত্য চক্রবর্তী □ ৩৮

সত্যজিত রায়ের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা সভা নন্দনে □ দেবাদিত্য চক্রবর্তী □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ উত্তর-পূর্বাঞ্চল : ৩০ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ পুস্তক-প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৪ জুন - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জলদূষণ — পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : শিক্ষার অধিকার

দেশের সমস্ত শিশুর শিক্ষায় মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবটি এন ডি এ সরকারের আমলে ২০০২ সালে উত্থাপিত হলেও তা আইনে পরিণত হতে কেটে গেল দীর্ঘ ৭ বছর। ২০০৯ সালে রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যাণ্ড কমপালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট (আর টি ই) কার্যকরী হলেও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সব শিশুর কাছেই কি শিক্ষার মৌলিক অধিকারের অঙ্গীকার পৌঁছে দিতে পেরেছি? বিশেষ করে যারা পেটের দায়ে শিশুশ্রম স্বীকার করেছে, তাদের কাছে শিক্ষার মৌলিক অধিকার কথাটা প্রহসনে পরিণত হয়নি তো? এই উদাসীনতার দায় কার?

আলোচনায় : **রাম মাধব ও বাসুদেব পাল।**

এছাড়াও অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি—অর্থনীতির বেহাল দশা

এক ধাক্কায় পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি সাড়ে সাতটাকা হিসাবে বাড়াইয়া দেওয়া নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। প্রত্যাশিত ভাবেই এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হইয়াছে তামাম বিরোধী শিবির-সহ সরকারের শরিকরাও। স্মরণ করা যাইতে পারে, মনমোহন সিং যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হন, তখন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন, দেশের অর্থব্যবস্থার প্রতি অনেক অবিচার করা হইয়াছে। নিজের এই ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতেই তিনি আর্থিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। এই দেশের মানুষ বড় আশা লইয়া তাই তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি তেলের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি করা হইল তাহাতে তাঁহার দায়বদ্ধতা, তাঁহার পুরনো প্রতিশ্রুতি মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে সরকারের ব্যাখ্যা হইল— বিশ্ব জুড়িয়া অর্থনৈতিক অস্থিরতার জেরে— ডলারের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়নের কারণে বিপুল ক্ষতি এড়াইতেই তেল সংস্থাগুলিকে দাম বাড়াইতে হইয়াছে। সচেতন নাগরিক মাত্রই বলিবেন, এই সময়ে এমন নজিরবিহীনভাবে দাম বৃদ্ধি সঠিক হয় নাই। সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ সোচ্চার এইজন্য যে, যদি পেট্রলের দাম বৃদ্ধি এতই জরুরী ছিল তবে সংসদ চলাকালীন সরকার তাহা ঘোষণা করে নাই কেন? সংসদের সমালোচনা এড়াইতেই এই সময়ে দাম বৃদ্ধির ঘোষণা, পেট্রলের এই দাম বৃদ্ধি তাই সরকারের দিশাহীনতা তথা ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। সরকার তেল-কোম্পানীগুলির উপর মূল্যবৃদ্ধির দায় চাপাইতে চাহিতেছে। কেননা তেল-কোম্পানীগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। তেল কোম্পানীগুলি নিজেদের ইচ্ছামতোই দাম কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। কিন্তু ইহা কথার কথা মাত্র। প্রণব মুখার্জী বা জয়পাল রেড্ডি কি বলিতে পারেন, তেল কোম্পানীগুলি যদি নিয়ন্ত্রণ মুক্তই হয়, তাহা হইলে দাম বাড়াইবার আগে তাহাদের সরকারের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয় কেন? প্রতি সপ্তাহে তেলের মূল্য লইয়া সমীক্ষা করা হইবে বলিয়া সরকার দেশের মানুষকে যে আশ্বাস দিয়াছিল তাহার কি হইল? প্রশ্ন উঠিয়াছে, আগে বলা হইত আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়িলে এখানেও পেট্রলের দাম বাড়িবে, কমিলে কমিবে। গত মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ১২৫ মার্কিন ডলার। বর্তমানে তাহা কমিয়া হইয়াছে ১০৮ ডলার। তাহা হইলে পেট্রলের দাম বাড়িল কেন?

ইউপিএ-১ এর আমলে পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধি অনেকবার করা হইয়াছে। ২০০৯ সালে ইউপিএ-২-এর কার্যকাল শুরুর সময়ে পেট্রলের দাম ছিল লিটার পিছু ৪০ টাকা। আজ তাহা বাড়িয়া ৭৪ টাকা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, তেল কোম্পানীগুলির যদি লোকসানই হয় তবে ডিজেল, কেরোসিন বা গ্যাসের দাম কেন বাড়ানো হইতেছে না? তেল কোম্পানীগুলি দাবী করিতেছে যে প্রতি লিটারে ডিজেলের জন্য ১৩ টাকা, কেরোসিনের জন্য ৩১ টাকা এবং রান্নার গ্যাসের জন্য ৪৭৯ টাকা লোকসান হইতেছে। একটি বিষয় ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট যে দেশের অর্থব্যবস্থার হাল খুবই শোচনীয় এবং টাকার মূল্য যেভাবে কমিতেছে তাহা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাই প্রমাণ করিতেছে। যে দেশের সরকারের প্রধানের পদে একজন অর্থনীতিবিদ রহিয়াছেন, তাহাদের প্রণীত নীতির ব্যর্থতায় তাই দেশের মানুষ আজ ক্ষুব্ধ, বিচলিত। এই ব্যর্থতার পরিণাম ইউপিএ সরকারকে ভুগিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ওই-সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মতো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা;—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি-মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হলো। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পোপের আদেশ মেনে ভারতকে খৃষ্টানীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সোনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অতি দ্রুত দেশকে খৃস্টানীকরণের পথে নিয়ে যেতে চাইছেন সোনিয়া। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার'-এর অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছে এমনই এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ইউ পি এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদে যাদের নিয়োগ করছে তাদের যোগ্যতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অহিন্দু— মূলতঃ খৃস্টান হওয়াই যোগ্যতার মাপকাঠিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সম্প্রতি 'কলাক্ষেত্র'-র ডিরেক্টর হিসেবে লীলা স্যামসনের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোয় বড়সড় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ২০০৫ থেকে তিনি ওই সরকারি সংস্থাটির ডিরেক্টরের পদ আঁকড়ে রয়েছেন। এছাড়া তিনি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে রয়েছেন— সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান এবং সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সেন্সার বোর্ড হিসেবে যা প্রসিদ্ধ)-এর চেয়ারম্যানের পদ। ইতিপূর্বে কলাক্ষেত্রের ডিরেক্টর থাকাকালীন তাঁকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান করা হলে বহু বিখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্ব 'এক ব্যক্তি, এক পদ'-এর দাবিতে সোচ্চার হয়ে সরকারি নাট্যসংস্থা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু লীলাদেবীর 'পদোন্নতি' তার পরেও অব্যাহত তো থাকেই, উপরন্তু সেন্সার বোর্ডের চেয়ারম্যানের মতো একটি প্রায় সর্বক্ষণের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। এহেন তিনটি মহা-গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব ছাড়াও লীলা নিজে একজন পেশাদার শিল্পী, ভারতনাট্যমের বিভিন্ন 'শো' আয়োজন করেন এবং নিজের একটি নাচের স্কুলও রয়েছে। এতসব সামলে সরকারি দায়িত্বগুলি কতটা পালন করছেন তা সহজেই অনুমেয়।

সবচেয়ে মজার কথা, লীলা যে বায়োডাটার দরুন এতটা 'পদোন্নতি' করেছেন, তাতে 'অ্যাডেড কোয়ালিফিকেশন' হিসেবে রয়েছে সোনিয়ার মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে ভারতনাট্যম শেখানোর কথা! সোনিয়ার খৃস্টান-প্রীতি তথা হিন্দু-বিরোধী মনোভাব শুধু লীলা স্যামসনেই থেমে থাকছে না। শ্যাম পিত্রোদা কতগুলি সরকারি কমিটির প্রধান পদে আসীন রয়েছেন তা অনুমান করা চলে।

কলাক্ষেত্রের পুরনো প্রতীক।

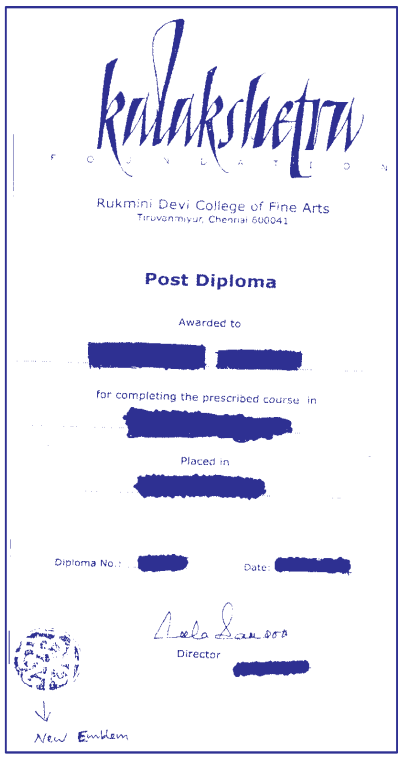

কলাক্ষেত্রের নতুন প্রতীক।

সোনিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা হলেন আহমেদ প্যাটেল। সোনিয়ার কোর টিমে রয়েছে এ কে অ্যান্টনি, অস্কার ফার্নান্ডেজ, ভিনসেন্ট জর্জ, সলমন খুরশিদ, মার্গারেট আলভা, কে ভি থমাস, ভায়লার রবি, টম ভাদাক্কান এবং পি জে কুরিয়নের মতো অহিন্দুরা। মজার ব্যাপার, প্রণব মুখোপাধ্যায় সরকারি কাজে অপরিহার্য হলেও সোনিয়ার কোর টিমে তাঁর তেমন গুরুত্ব নেই। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও সেই কোরটিমে ব্রাত্য।

আর এই খৃস্টানীকরণের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাতে হচ্ছে লীলা স্যামসনের পরিচালনাধীন কলাক্ষেত্রকেই। যার প্রতীক গণেশের ছবি হটিয়ে দিয়ে 'সেকুলার' ছবি আমদানি করা হয়েছে। কলাক্ষেত্রের সূচনালগ্নে রুক্মিনী দেবী অরুণডালের আধ্যাত্মিক বাণী ছিল তার লোগোতে। রুক্মিনীদেবী অহিন্দু ছিলেন না, হিন্দু-বিরোধীও ছিলেন না। তাই প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা মেনে হিন্দু-সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল তাঁর অধ্যাত্মবাদে। লীলাদেবীর জমানায় তারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, সোনিয়ার এহেন খৃস্টান-প্রীতি পোপের সেই 'অমোঘ' বাণী, 'একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের লক্ষ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' থেকেই উৎসারিত।

অপহরণকারীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তিন কিশোর। বাঁ দিক থেকে অজয় নাও, নাওথৌবি ও সুরান।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবলে মণিপুরী শিশুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ক্যাডারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। তাই নতুন ক্যাডার তৈরির জন্য মণিপুরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আবার ছোট ছেলেমেয়েদের রিক্রুট করা শুরু করলো। যদিও এধরনের রিক্রুটমেন্ট তাদের নতুন কিছু নয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই পরিস্থিতি একদিকে যেমন মণিপুরী বাবা-মায়ের কাছে ঘোরতর উদ্বেগজনক, অন্যদিকে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অশনি-সংকেত বয়ে আনছে বলে ওয়াকিবহাল মহল থেকে মন্তব্য করা হয়েছে।

গত একমাসে ১০টি শিশু অপরহরণের ঘটনায় আতঙ্কিত মণিপুরী বাবা-মায়েরা এখন তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে কিংবা খেলার মাঠে পাঠাতেও যথেষ্ট আতঙ্কিত বোধ করছেন।

গত ৭ এপ্রিল তিনটি বালক--- চানাম অজয়নাও, সোরাইসেম নাওথৌবি এবং স্বপম সুরেন অপহৃত হয়। অভিযোগ--- কাঙলেইপাকের পিপলস রেভোলিউশানারি পার্টি তাদের অপহরণ করে। ওই তিনটি বালকেরই বয়স চৌদ্দ-র আশপাশে, ইম্ফল, পশ্চিম জেলার সৈরেম গ্রামের বাসিন্দা। তাদের গ্রামের ২ কিমি দূরে আতং ঘুমান স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে তারা তিনজনই অপহৃত হয়। এনিয়ে মিডিয়ায় হৈ-চৈ হবার পর গত ২২ এপ্রিল চাপের মুখে অপহৃতদের মণিপুর- মায়ানমার সীমান্তে নো-ম্যান্স ল্যান্ড থেকে মুক্তি দেয় মণিপুরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এরপরেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই কীর্তি সামনে আসে।

গত ২১ এপ্রিল ১২ বছরের রাহুল তাখেল্লামবম নামে ইম্ফলের ডনবস্কো স্কুলের ক্লাস ফাইভের একটি ছাত্রকে হস্টেলে যাওয়ার পথে অপহরণ করে মণিপুরী জঙ্গিরা। তার মুক্তির জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্টের কাছে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। তিনদিন বাদে তাকে যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কীর্তি ফাঁস করে দেয়।

মণিপুরে ৩৭টি জঙ্গি-বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এই মুহূর্তে সক্রিয়। মায়ানমার সংলগ্ন জঙ্গলই এদের মূল ঘাঁটি। পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী ২০০৮ থেকে আজ অবধি ৬৬ জন বালক অপহৃত হয়েছে যাদের বয়স ৮ থেকে ১৭-র মধ্যে।

প্রকৃত সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি। কারণ নিরাপত্তার অভাবে অনেক অপহৃত বাচ্চাদের বাবা-মা অভিযোগই করেননি পুলিশের কাছে। যেমন এল পাঙ্গালকানবা সিং (বয়স ১৬) এবং ওয়াই নিঙ্গদেম (বয়স ১৮)--- উভয়েই সেইরেমের নিকটবর্তী হাওরাং কেইরাঙ গ্রামের বাসিন্দা এবং গত ১৪ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ। কিন্তু তাদের বাবা-মা এনিয়ে পুলিশে কোনও অভিযোগ জানাননি।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন মণিপুরী জঙ্গিদের লক্ষ্যটা খুব পরিষ্কার। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্থানীয় এজেন্ট সেই সমস্ত শিশু বালকেই 'টার্গেট' করে যাদের পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত। এই এজেন্টরা সাধারণত তার নিজের গ্রাম থেকেই শিশুদের অপহরণ করে এবং অপহৃতদের সম্পর্কে সেই এজেন্টের পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল থাকার কথাই অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরা সেই 'টার্গেটে' থাকা বাচ্চাটির ছবি ও যাবতীয় তথ্য যোগাড় করে।

পরবর্তী পর্যায়ে মোবাইল ফোন, জুতো, টি-শার্ট কিংবা গাড়িতে চড়ানো ইত্যাদি লোভ দেখিয়ে জঙ্গিদের ডেরায় পৌঁছে দেয় ওই এজেন্টরা। প্রত্যেক শিশু পিছু ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পায় এরা।

রাষ্ট্রপতি পদে পছন্দের প্রার্থী

সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া টুডে' গ্রুপ ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে 'আপনার রাষ্ট্রপতি পছন্দ করুন' এই মর্মে নিজেদের মতামত জানাতে আহ্বান জানিয়েছিল। তাতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে কালাম-কেই আবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন বেশির ভাগ মানুষ। পছন্দের ফলাফলটা হলো এইরকম—

নাম	অন লাইন	এসএমএস
▯ এপিজে কালাম	৭৬.৮৮	৬৭.৫৭
▯ প্রণব মুখার্জী	৮.০৩	১৫.২
▯ আন্না হাজারে	১০.১৮	১১.০৪
▯ হামিদ আনসারি	৩.৩৬	৩.১
▯ মনমোহন সিং	১.৫৫	৩.১

এপ্রিল-মে মাসের নির্বাচনী সমীক্ষায় এগিয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীক্ষার ফল বাজারে এসেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের তৃতীয় বৎসর পুর্তি উৎসবের প্রাক্কালে সমীক্ষাটি যে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কপালে ভাঁজ ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সমীক্ষা অনুযায়ী দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার তাদের জনপ্রিয়তা অনেকটাই খোয়াতে বসেছে। উলটো দিকে উঠে আসছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। এবিপি নিউজ-এসি নিয়েলসন সংস্থা এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে দেশের ২৮টি শহরে এই সমীক্ষাটি চালায়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে ভারতীয় জনতা পার্টি ২৮ শতাংশ ভোট পেতে পারে, যেখানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের ঝুলিতে যাবে ২০ শতাংশ ভোট।

সমীক্ষার বিস্তৃত রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের ৬৯ শতাংশ এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে রাজি আছেন। কিন্তু যে ৩১ শতাংশ মানুষ কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাদের মধ্যে ১২ শতাংশ বিজেপি-কে চাইছেন। অন্যদিকে বিজেপি-কে ২০০৯ সালে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৮৪ শতাংশই আবার বিজেপি-কেই চান। বাকি সরে যাওয়া ১৬ শতাংশের মধ্যে মাত্র ২

শতাংশ কংগ্রেসের দিকে যেতে চান।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও ব্যাপক দুর্নীতিই যে কংগ্রেসের থেকে জনতার মুখ ফেরানোর কারণ সমীক্ষা থেকে সেটাও মোটামুটি আঁচ করা যাচ্ছে। সমীক্ষা অনুযায়ী লোকের পছন্দসই প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্ভাব্য জনপ্রিয়তার নিরিখ ধরা হয়েছে তাতে বিজেপি-র গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন। এই নিরিখে মনমোহন সিং পেয়েছেন ১৬ শতাংশ সমর্থন। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো গত বছরেও এই সময় একই ধরনের জনতার পছন্দ শীর্ষক সমীক্ষায় নরেন্দ্র মোদীর স্থান ছিল চতুর্থ (১২ শতাংশ)। সেই সময় আজকের মনমোহন সিং ছিলেন শীর্ষে (২১ শতাংশ)। প্রসঙ্গত রাহুল গান্ধী সমীক্ষা অনুযায়ী গত বছরের ১৯ শতাংশ থেকে ১৩-তে নেমেছেন, সঙ্গে মাকেও নিয়েছেন। সোনিয়া ১৪ শতাংশ থেকে একেবারে ৯-এ পৌঁছে একক সংখ্যা ছুঁয়েছেন। অবশ্যই এ সবই সমীক্ষা।

সদ্য সমাপ্ত উল্লেখিত সমীক্ষাটি থেকে আরও জানা যায়, বিগত বছরের ৪০ শতাংশ মানুষ ইউ পি এ-দুই সরকারের কাজকে ভাল বললেও এবারে ওই পছন্দ ৩২ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু বিজেপি-র পক্ষে চিন্তার কারণ— ঘেঁটে যাওয়া এই ৮ শতাংশের মাত্র ১ শতাংশ তার দিকে আসছে। বাকিটা যাচ্ছে প্রাদেশিক দলগুলির ঝুলিতে। যাইহোক, কিছুটা হলেও বিজেপি এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে অগ্রসরমান, এটিই সমীক্ষার সারাংশ। সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সমীক্ষার আওতায় আসা শতকরা ৫৪ শতাংশ মানুষ একবাক্যে জানিয়েছেন ২ জি কেলেঙ্কারী নতুন বিদেশী বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

সিপিএম-ই স্বীকার করছে তারা হত্যার-রাজনীতি করে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সিপিএম যে হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে তা আরও একবার প্রমাণিত হলো কেরলের দলের বিশিষ্ট নেতা ও ইদ্দুক্কি জেলার সম্পাদক এম এম মানি-র সাম্প্রতিক মন্তব্যে। গত ২৫ মে ইদ্দুক্কি জেলার মানাক্কাদ-এ এক দলীয় সভায় তিনি বলেছেন, ''হ্যাঁ, আমরা সিপিএমের শত্রুদের খতম করেছি। পার্টির কাছে একটা 'হিটলিস্ট' তৈরি আছে আর সেই অনুযায়ী তার প্রত্যেকটিই কার্যকরও করা হয়েছে।''

উল্লেখ্য, শ্রীমানি কেরলে দলের সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন। ঝুলি থেকে এভাবে

এম এম মানি

বেড়াল বেড়িয়ে পড়ায় দলীয় নেতৃত্ব এখন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ মাঠে নেমে পড়েছে। প্রায় গত দু' দশক ধরে কেরলে, বিশেষত কন্নড় জেলায় সিপিএমের গুণ্ডারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের একের পর এক হত্যা করছে। কমবেশী ৫০ জনের মতো স্বয়ংসেবক নিহত হয়েছেন।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যখন কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করার কথা বলে, তখন আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে তা ভয়ঙ্কর। এই ভাষা তো সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী ও নকশালবাদীদের ভাষা। এখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোথায় গেল? এ নিয়ে দিল্লী কি ঘুমোচ্ছে, কেরল সরকারই বা কি করছে?

এই রকম কাজের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া দরকার।

দেশকে বিদেশী বণিকদের কাছে বেচে দিতে চাইছে কংগ্রেস

দেশজুড়ে পেট্রোল এবং পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আদতে ভারতের আর্থিক কাঠামোটাই ভেঙে পড়ার অশনিসঙ্কেত জানিয়েছে। অনেকেই ধরতে পেরেছেন যে, দেশ একটা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অপরিণামদর্শিতার জন্যই দেশ আজ ডুবছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিজে একজন অর্থনীতিবিদ। প্রণববাবুর ভ্রান্ত অর্থনীতি কীভাবে ভারতকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। সব জেনেও তিনি কাঠের পুতুলের মতোই চুপ করে আছেন। একটি কথাও বলেন না। প্রণববাবুও জানেন যে এইবারই তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকার শেষ সময়। তাঁর ইচ্ছা এরপর ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার। তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয় কিনা দেখতে জুলাই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রণববাবু চেয়েছিলেন ভারতে বিদেশী পুঁজির সরাসরি অবাধ প্রবেশ। বিদেশী পুঁজি বলতে সাধারণভাবে মার্কিন বহুজাতিক শিল্পগোষ্ঠীর বিনিয়োগের কথা বলছি। ভারতকে বিদেশী বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিলে সাময়িকভাবে আমরা অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে হয়তো মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু সেই মুক্তি স্থায়ী হোত না। অর্থনৈতিকভাবে পরাধীনতার বেড়ি পায়ে পরতে হোত। যেমন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে বেড়ি পরতে হয়েছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল দেশকে বিদেশী বণিকদের কাছে বেচে দিতে চাইছে। দেশকে বাঁচাতে চাইলে অবিলম্বে কংগ্রেসকে ক্ষমতার গদি থেকে সরাতে হবে। চরম দুর্নীতিপরায়ণ এই দলকে সরাতে না পারলে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য।

সবচেয়ে বিপদের কথা হচ্ছে, কেন্দ্রে এখন রাজনৈতিক ক্ষমতাধররা দেশজুড়ে লুঠ চালাচ্ছে। জনগণের করের টাকা হরির লুঠের মতো কিছু লোক পকেটে পুরছে। দুর্নীতির এমন বিস্তার অতীতে দেখা যায়নি। কেন্দ্রে মন্ত্রী, আমলা, দালাল সকলেই জানে যে কয়েক হাজার কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব মেরে দিলে বড় জোর মাস তিনেকের জন্য তিহার জেলে বিশ্রামে যেতে হবে। তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই। দিল্লীর তিহারে ভি ভি আই পি চোর লুঠেরাদের আরামে থাকার জন্য বিশেষ বিলাসবহুল সরকারি গেস্টহাউস করা হয়েছে। এই সব ভি ভি আই পি সমাজ বিরোধীদের দেখভাল করার জন্য নোকর-চাকর খিদমতগার সবই চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত আছে। সত্যিকথা বলতে কি, দিল্লীর তিহার জেল কেন্দ্রের মন্ত্রী— আমলাদের এখন নিরাপদ আরামদায়ক বিশ্রামাবাস। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ১৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন আন্না হাজারে। তাঁর দুর্নীতির অভিযোগের তালিকায় এক নম্বরে আছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। আন্না ও তাঁর সহযোগীদের

গূঢ়পুরুষের

কলম

অভিযোগ, প্রণববাবু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকাকালে সাবমেরিন কেনার সময় বিপুল অর্থ দালালি বাবদ ভাগবাঁটোয়ারা হয়েছে। দালালির টাকাটা ডলারে দেওয়া হয় এবং বিদেশী ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে যখন কয়লা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল সেই সময় বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাকে জলের দরে লাভজনক 'ওপেনকাস্ট' কয়লাখনির দীর্ঘ মেয়াদি লিজ দেওয়া হয়। ফলে কোল ইন্ডিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক লক্ষ কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হয়। ভারতের কমপ্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেলের (সি এ জি) রিপোর্টে কয়লা মন্ত্রকের এতবড় দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও প্রধানমন্ত্রী আজও কোনও ব্যবস্থা নেননি। কেন? সি এ জি রিপোর্টের ভিত্তিতেই আন্না সরকারি তহবিল লুঠের অভিযোগ এনেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম, শরদ পাওয়ার, এস এস কৃষ্ণ, কমলনাথ, প্রফুল্ল পাটেল, বিলাসরাও দেশমুখ, বীরভদ্র সিং, কপিল সিব্বল, সলমান খুরশিদ, জি কে ভাসান, ফারুখ আবদুল্লা, এম কে আলাগিরি এবং সুশীল কুমার শিন্ডের বিরুদ্ধে।

সীমাহীন দুর্নীতি ও লুঠের জন্যই আজ দেশের অর্থনীতি বিপন্ন। বিদেশী— স্বদেশী কোনও বড় শিল্পসংস্থাই এখন ভারতে বিনিয়োগ করতে চাইছে না। পাঁচ বছর আগেও আমাদের বিদেশী মুদ্রার বিপুল সঞ্চয় ছিল। এখন নেই। লুঠ হয়ে গেছে। আই পি এল ক্রিকেটের নামে দেশের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা 'ডলার' চালান করা হয়েছে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। এবং তা করা হয়েছে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন 'ফেরা'— 'ফেমা' ইত্যাদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। আয়কর দফতরকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। দেশের টাকা লুঠ করে যারা বিদেশী ব্যাঙ্কে অবৈধভাবে জমা রেখেছে তাদের তালিকা প্রণববাবুকে দিয়েছে সুইৎজারল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও বৃটেন। কিন্তু প্রণববাবু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সেই তালিকা 'অতি গোপনীয়'। প্রকাশ করা যাবে না। তবে আয়কর দফতর সেই লুকানো টাকার কর আদায় করছে। প্রণববাবুর কথা বিশ্বাস করলেও জানতে ইচ্ছা করে দুর্নীতির অভিযোগে এইসব কালো টাকার আমানতকারীদের বিরুদ্ধে ভারতের আদালতে ফৌজদারি আইনে মামলা দায়ের করা হবে না কেন? শুধু বকেয়া কর আদায় করেই ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা কালো টাকার মালিক— মালকিনদের নাম প্রকাশিত হলে জনরোষে কংগ্রেস পার্টিটাই উঠে যাবে। এ কথাও হয়তো ঠিক যে দেশে এখন দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক দল খোঁজাটা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার চেয়েও কঠিন। এই অন্ধকার পটভূমিকায় দেশের ১০টি রাজ্যের ২৮টি বিধানসভার আসনে জুন মাসেই উপনির্বাচন হচ্ছে। এই রাজ্যগুলি হলো, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গোয়া, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন কতটা আছে তার একটা নমুনা জানা যাবে ১৫ জুনের ফল ঘোষণায়। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া সদর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ১২ জুন। ওই দুটি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে ছিল। যদি একটি আসনও হাতছাড়া হয় তবে বুঝতে হবে যে কেন্দ্রে ইউ পি এ জোটের শরিক হওয়ার জন্যই তৃণমূল জন সমর্থন হারিয়েছে। সেক্ষেত্রে দলের নেত্রী কী করবেন সেটাই দেখার।

পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের লক্ষ্য

সিপিএমকে স্তব্ধ করা ও কংগ্রেসীদের তৃণমূলে আনা

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

এখন সারাদেশে একটি ঘটনা আলোড়ন ফেলেছে তা হলো পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি। এর বিরুদ্ধে গত ৩১ মে বিজেপি ভারত বন্ধ ডাকে। সিপিএম বিরোধিতা করেনি এই বন্‌ধের। সিপিএম একই দিনে প্রতিবাদ দিবস পালন করে

> **এটা এখন স্পষ্ট যে, যে-কটি পুরসভার নির্বাচন হচ্ছে কোনও একটিতেও সিপিএমের কর্মী সমাবেশ করা সম্ভব হবে না। তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''হলদিয়াতে সিপিএম মুছে যাবে।'' হলদিয়াতে শুধু সিপিএমের এমনকী রাজ্যের জোট সরকারের শরিক কংগ্রেস দলের নেতৃত্ববৃন্দও বলছেন, তৃণমূল তাঁদের কর্মীদের আক্রমণ করছে।**

রাস্তায় নেমেছে। অবশ্যই সিপিএমের রাস্তায় নামাটা প্রতীকীমাত্র। কারণ সিপিমের ছাত্র-যুব বাহিনী বসে গেছেন। এই বসে যাওয়াটা শুধু পাল্টা মারের ভয়ে নয়, তীব্র নেতৃত্ব বিরোধী মনোভাবের দরুন পার্টির তরুণ কর্মীরা উৎসাহিত হচ্ছেন না। বিমান বসুর সেই একঘেঁয়েমি বক্তৃতা কাউকেই উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না এবং পারবেও না। কেন্দ্রীয় নেতাদের দিয়ে বক্তৃতা করিয়েও নিচেরতলার কর্মীদের উৎসাহিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সিপিএম বিরোধী। সিপিএমের পক্ষের মানুষজন নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীন। জেলা কমিটিগুলিতে তীব্র দ্বন্দ্ব কোনও রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে নয়— কে নেতা হবেন তাই নিয়ে লড়াই।

রাজ্য-নেতৃত্বের মধ্যে চলেছে ক্ষোভ। রবীন দেব ভাবছেন তিনি কি কারণে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেতে পারলেন না? নিজ জেলায় বিচ্ছিন্ন দীপক দাশগুপ্ত কিসের জোরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গেলেন? তিনি তো মেদিনীপুরে ব্যর্থ হয়েছেন! বুদ্ধবাবুকে পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য গুরুত্ব দেন না। বুদ্ধবাবুও সেই একই ভাঙারেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি তো প্রত্যহই নন্দন-এ যেতেন। নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছিলেন।

শিল্পী সাহিত্যিকদের বৃহদাংশ বুদ্ধ-বিরোধী। প্রয়াত এক শিল্পী এর আগের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি বেসরকারি চ্যানেলে বুদ্ধবাবুর সামনেই বলেছিলেন, ''বুদ্ধ নিচের তলার কর্মীদের সতর্ক কর।'' বুদ্ধবাবু তার উত্তরে বলেছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তখন তো ২৩৫-এর গরমে অভ্রংলেহি মনোভাব। পরাজয়ের পর আজ বিমান বসু বলছেন, ''ভুল রিপোর্ট দিয়ে নেতাদের উজবুক বানানো হয়েছে।''

এটা এখন স্পষ্ট যে, যে-কটি পুরসভার নির্বাচন হচ্ছে কোনও একটিতেও সিপিএমের কর্মী সমাবেশ করা সম্ভব হবে না। তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''হলদিয়াতে সিপিএম মুছে যাবে।'' হলদিয়াতে শুধু সিপিএমের এমনকী রাজ্যের জোট সরকারের শরিক কংগ্রেস দলের নেতৃত্ববৃন্দও বলছেন, তৃণমূল তাঁদের কর্মীদের আক্রমণ করছে।

তৃণমূলের লক্ষ্য হলো এই পুরসভার নির্বাচনের মধ্যে সিপিএম-কে স্তব্ধ করা এবং কংগ্রেসকর্মীদের বার্তা দেওয়া— ''কংগ্রেস শেষ হবে— তৃণমূলে এসো।'' ইতিমধ্যে সিপিএমের ক্ষমতালোভী কর্মীদের একাংশ তৃণমূলে যাচ্ছেন। এরফলে অবশ্য তৃণমূলে নব্য তৃণমূলী এবং পুরানো তৃণমূলীদের মধ্যে দলাদলি, মারামারিতে পর্যবসিত হয়েছে।

বস্তুত এরাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেসের জোট নেই বললেই চলে। তৃণমূলের একাধিক নেতা বারংবার বলেছেন, ''কংগ্রেস ছাড়াই তাঁরা পাঁচ-বছর সরকার চালাবেনই।'' এর জবাবে মালদহের কংগ্রেস নেতা তথা এ বি গনিখান চৌধুরীর ভ্রাতা ডালু বলেছেন, ''রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূলের সাহায্য নেবার দরকার হবে না।'' প্রসঙ্গত প্রণব মুখার্জি-কে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি আছে। তিনি একাধিকবার তাঁর অর্থমন্ত্রীকে বলেছেন, ''প্রণবদাকে বিশ্বাস করবেন না।'' মূলত আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে একথা বলা হলেও একসময় মমতা-প্রণব বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মমতার বিরুদ্ধে নাম না করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, ''আমাদের দলের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূলের হাতে। এটা বরদাস্ত করা যায় না। এর ফল ভয়ানক হতে পারে।''

প্রিয়-জায়া কংগ্রেস সাংসদ দীপা দাসমুন্সি বক্তৃতায় বলেছেন, ''কংগ্রেসের সাহায্যেই তৃণমূল ক্ষমতাসীন। কংগ্রেস সরে গেলে তৃণমূল শূন্যে পরিণত হবে। দীপা দাসমুন্সি আরও বলেছেন, ''কলকাতাকে নীল- সাদা রঙ দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এই রঙ আসছে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভেনুর একটি বিশেষ দোকান থেকে। দেখতে হবে এই দোকানের সঙ্গে মমতার কোনও আত্মীয় জড়িয়ে আছে কিনা?'' দীপা দাসমুন্সি ছাড়া মমতার বিরুদ্ধে শরিক কংগ্রেস দলের নেতা অরুণাভ ঘোষ, নির্বেদ রায়, প্রদীপ ঘোষ সোচ্চার। ছোড়দা অর্থাৎ সোমেন মিত্র-কে তো কোণঠাসা করা হয়েছে। তিনি তলে তলে কি করছেন? এদিকে কলকাতা পুরসভার ৮৮নং ওয়ার্ডের কাউনসিলার মালা রায় জল সরবরাহের অপ্রতুলতার সমালোচনা করলেন। মেয়র শোভন চ্যাটার্জি বলেন, ''তরমুজের আমদানি বেশি হয়েছে। মালাদেবী বামপন্থীদের পাশে বসলেই পারেন।'' এটাও স্পষ্ট কলকাতা পুরসভায় বিরোধী নেত্রী মেয়রের বিরুদ্ধে কোনও তীব্র সমালোচনা করেন না!

হাততালি দিন, ‘মাওবাদী’ প্রশ্ন করবেন না

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

দিদি, আমি আজ চিঠিতে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, প্লিজ আমাকে মাওবাদী বলবেন না।

গরমটা একটু কমেছে। কিন্তু সেদিন কলকাতার গরম ছিল চল্লিশের ঘরে। মানে বৃষ্টি তো নামল জামাই ষষ্ঠীর দিন। তার আগের দিন আপনি পথে নেমেছিলেন। পিচ গলানো গরমে আপনি দেখিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এক বছর পরও বিরোধী নেত্রীর ভূমিকাটা ভোলেননি। দিল্লী থেকে ১০ নম্বর জনপথ কিংবা ৭ নম্বর রেসকোর্সের বাসিন্দারাও সেদিন টিভিতে দেখলেন আপনার অগ্নিকন্যা চেহারা। কলকাতায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারাও দেখলেন সেই বিরোধী চেহারা। দেখলেন বিজেপি নেতারাও। আর দেখলাম আমরা।

সত্যি বলছি দিদি, দেখতে দেখতে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আপনি কোন দলে। আপনি কি ইউ পি এ সরকারের বিরোধী? নাকি বাম-বিজেপি বিরোধী? গুলিয়ে গেল সব। আগেও গেছে। এদিন বেশি করে গেল। কারণ, এমনভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলের মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে সরকার বিরোধী মিছিল করেন? মহাকরণ কিংবা দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তোপ দাগা আর পথে নেমে মিছিল করার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক দিদি!

যতদূর জানা আছে, কেন্দ্রে আপনার একজন পূর্ণমন্ত্রী এবং ছ'জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। এটাও জানি যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কোনও বৈঠক করলে সেখানে সকলকে ডাকাটাই বিধি। আর সেই বৈঠকে কেউ উপস্থিত না থাকলেও সেখানে নেওয়া সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ দু'য়ের দায় নিতে হয়। আপনি তাই সেই বৈঠকে কাউকে উপস্থিত না রেখে বিরোধিতায় নামলে যে সাত খুন মাপ করা যায় না! আপনাদের না জানিয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই ধোঁকা অনেক খেয়েছি দিদি। আর টেস্ট পাই না। এবার অন্য স্বাদের কিছু খাওয়ান প্লিজ। বরং বারবার মনে হয়, তাহলে কি মনমোহন সিং-রা আপনাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না? কিন্তু আপনিই তো বলেন যে, আপনার হাতেই নাকি কেন্দ্রের বাঁচা-মরার জাদু কাঠি! আপনিই তো বলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনমোহন সরকারের প্রাণভ্রমরা।

আসলে দিদি, আপনি গাছেরও খাচ্ছেন, তলারও কুড়োচ্ছেন। যদি গাছের খেতেই হয় তবে মন দিয়ে ইউ পি এ-টা করুন। আর যদি তলারই কুড়োতে হয় তবে বেরিয়ে আসুন। ভয় নেই সরকার পড়ে যাবে না। প্রণব মুখোপাধ্যায়রা টিকে থাকার ব্যবস্থা করেই তারপর আপনাকে খোঁচাচ্ছে। জানি না, জোট রাজনীতির এই বাজারে আপনাকে ভবিষ্যতে হয়তো এন ডি এ মহা আদরে ডেকে নেবে। কিন্তু তখনও তো আপনি গাছের খেয়ে তলার কুড়োনো কাজটা চালিয়ে যাবেন।

এবার চিঠিতে দিদি আপনাকে অনেক কিছু বলার আছে। অনেক প্রশ্ন জমে গেছে মনে। আপনার বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রচুর প্রচার চালাচ্ছেন। টিভি, রেডিও, হোর্ডিং এসব তো আছেই। সেই সঙ্গে ভাড়া করা চ্যানেলেরা তো দিনরাত গুণ গেয়ে চলেছে। কিন্তু সেদিন টাউন হল থেকে ওই ইংরাজি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে আপনি এটা কী করলেন? একদল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আপনাকে কতগুলো নিরাপরাধ প্রশ্ন করেছিল। আপনি বলতেই পারতেন তার উত্তর আপনি দেবেন না। বলতেই পারতেন নিজের পছন্দের জবাব। কিন্তু আপনি মাঝপথে অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। তাতেও আমার কোনও আপত্তি করার নেই। কিন্তু আপনি ওই ছোট ছোট মেয়েগুলোর গায়ে যেমন নির্দ্বিধায় মাওবাদী লেবেল সেঁটে দিলেন তাতেই আমার আপত্তি। এর আগে আপনি সাংবাদিকদের গায়ে, সংবাদমাধ্যমের গায়ে লেবেল সেঁটেছেন। কিন্তু এতে যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেল বাংলার। গোটা পৃথিবী এখন ইন্টারনেটে সেই অনুষ্ঠানের ক্লিপিংস দেখছে। এতদিন যারা আপনাকে শুধু ফ্যাসিস্ট বলছিল তাঁরা এবার পাগল বলতে শুরু করেছে। ফেসবুক, ট্যুইটারে আপনার নিন্দার ঝড়ে কান পাতা দায়।

আমিও দিদি, বারবার ওই অনুষ্ঠানটা দেখেছি। আর তাতে মনে হয়েছে সেদিন আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে আপনি সব সময়ই ভাড়া করা হাততালি দেওয়ার লোকেদের সামনে কথা বলতে পছন্দ করেন। ঘোরেন একদল মোসায়েবকে সঙ্গে নিয়ে। যাঁদের সামনে আপনি রাতের বেলা সূর্যোদয় বললেও ‘ঠিক ঠিক’ইকো শুনতো পান। এর আগে তাঁদের আপনি ছেঁটে দিয়েছেন। আপনি বাছাই বাধ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নেরই শুধু উত্তর দিতে পছন্দ করেন। বাকিদের প্রশ্ন করার অধিকার ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছেন। কেউ বেফাঁস কিছু জিজ্ঞেস করে বসলে তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে ছাড়েন না। কলকাতা থেকে গ্রাম সর্বত্র একই ভাষায় একই বিষয়ে একই ভঙ্গিতে একই কথা বারবার বলে আসছেন। একই ভাষায় সিপিএমের সমালোচনা করে আসছেন। একই রকম ভাবে ৩৪ বছর বনাম এক বছরের গান গেয়ে আসছেন। সর্বত্রই আপনার পোষা মানুষেরা হাততালি দিয়ে আসছেন। আর এটা করতে করতে আপনি হাততালি শোনা ছাড়া অন্য কিছু শুনতেই ভুলে গেছেন। কিন্তু দিদি ওটাই গোটা বাংলা নয়। এই বাংলাতে একটা অন্য প্রজন্মও আছে। যাদের টিকি বাঁধা নেই আপনার কাছে। ওরাই এসেছিল সেদিনের অনুষ্ঠানে।

ওরাই তো সেই প্রজন্ম যারা
নির্ভীক চিত্তে বলে দিতে পারে
রাজামশাই, তোমার পোশাক
কোথায়?

—**সুন্দর মৌলিক**

৩৪ বছর বনাম ১ বছর

বামেদের সঙ্গে মমতার পার্থক্য কতটা?

সাধন কুমার পাল

মে ২০১২। পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের মাস। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের বর্ষপূর্তি এই মাসেই। সরকারি ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও বেসরকারি ভাবে রাজ্যজুড়ে চলছে মিছিল, মিটিং, পদযাত্রাসহ নানা ধরনের কর্মসূচী। দিদির নির্দেশ এই বর্ষপূর্তিতে ধূমধাম করে মানুষ-কে মা-মাটি-মানুষের সরকারের একশোতে একশো অর্থাৎ পাঁচ বছরের কাজ এক বছরে করে ফেলার বিষয়টি বোঝাতে হবে। শোনা যাচ্ছে মা- মাটি-মানুষের সরকারের এক বছরের কাজের মাহাত্ম্য প্রচার করতে মাত্র ২০ কোটি টাকার আনুমানিক বাজেট ধরে রাখা হয়েছে।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে, মিছিলের সামনের সারিতে হেঁটে গলার শিরা ফুলিয়ে না হয় বলা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে গত এক বছরে দিদি জঙ্গলমহল ও দার্জিলিং-এ শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইমামদের ও মসজিদের আজান দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট লোকেদের ভাতার ব্যবস্থা, জেলায় জেলায় মুসলমানদের চাকরি, ব্যবসা, ঋণ, ১৭ লক্ষ মুসলিম পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ড (যা কিনা বামজামানায় তিন লক্ষ ছিল) দেওয়া, দশ হাজার মাদ্রাসার অনুমোদন প্রদানের ঘোষণা, রাজ্যে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ-কে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি জেলায় পৃথক সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণের মতো সমস্ত কাজই করা হয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত সাফল্যের ফিরিস্তি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নেতারা মানুষের মুখোমুখি হতে গেলেই গোল বাঁধছে।

কারণ তৃণমূলকে ভোট দিলেও হাতে গোণা দু'চার জন ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই যেমন তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার পড়ে দেখেনি তেমনি রাজ্যের সমস্ত মানুষ মুসলমানও নয়। স্বাভাবিক ভাবেই মমতা ভুলে গেলেও বা মনে করতে না চাইলেও ওঁর প্রাকনির্বাচনী বক্তব্যই এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতার কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার। আর ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতাই গোলটি বাঁধাচ্ছেন।

মমতা ক্ষমতায় অভিষিক্ত হওয়ার প্রথম বছরেই নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ছুতোয় মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়-কে রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে সেখান থেকে ফিরে আসা বা এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণাম থেকে এ রাজ্যকে বাঁচানো সহজ কথা নয়। খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হবে ব্যক্তি মমতা সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী হলেও নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপের নিরিখে বামেদের সঙ্গে মমতার পার্থক্য সামান্যই।

এই তো এক বছর আগে বিরোধী নেত্রী হিসেবে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় মমতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে পেটের ভাতের খোঁজে এ রাজ্যের মানুষকে ভিন রাজ্যে যেতে হবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও দলতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না, স্কুলে স্কুলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে যাবে, খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাট সেরে উঠবে, রেশন মিলবে প্রতিসপ্তাহে নিয়ম করে, বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে পুলিশ-প্রশাসন, বাম জামানার মৃত্যুপুরী সরকারি হাসপাতাল হয়ে উঠবে আরোগ্য নিকেতন, খুলবে বন্ধ কলকারখানা, পরিত্যক্ত শিল্পের জমিতে গড়ে উঠবে নতুন শিল্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় উনি ক্ষমতাসীন হলে বাংলা মা আবার ভারত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

বর্ষপূর্তিতে মা-মাটি-মানুষের সরকারের এত বড় সাফল্যের গল্প শুনে অনেক মানুষই তৃণমূলের লোকেদের পেলেই জানতে চাইছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ওঁর সরকারকে একশোতে একশো দিচ্ছেন এর অর্থটা কি? কারণ শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছ-মাস হয়ে গেল এখনও অনেক স্কুলেই পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায়নি, স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণটোকাটুকি, শিক্ষক পেটানো থেকে শুরু করে নানা বিশৃঙ্খলা একটুকুও কমেনি, নতুন করে কিছু ডাক্তার নিয়োগ ও শয্যা সংখ্যা বাড়ালেও সরকারি

হাসপাতালগুলির চেনা মৃত্যুপুরীর দৃশ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি, খোলেনি বন্ধ কলকারখানা, গড়ে উঠেনি নতুন শিল্প, সাপ্তাহিক রেশন বাম জামানার চেয়েও অনিয়মিত, পরিসংখ্যানে ১০০ দিনের কাজ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখালেও ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এলে কোথায় পেটের ভাতের ব্যবস্থা হবে মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না, এলাকাভিত্তিক কিছুকিছু কাজ হলেও রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশের রাস্তাঘাটে বাম জামানার খানাখন্দ পরিবর্তন হয়ে বড় বড় গর্তে পরিণত হয়েছে, নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো সারে একপয়সাও ভর্তুকি না দেওয়ার ফলে বেড়েছে সারের দাম, কৃষকরা ফসলের নায্য দাম পাচ্ছে না, ঋণের দায়ে বামজামানার মতোই আত্মহত্যা করছেন কৃষকরা।

এই সমস্ত প্রশ্নের মুখে পড়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতৃবৃন্দ। অনেকে হয়তো বলছেন এক বছরে আর কতটা করা সম্ভব? ধৈর্য ধরুন, নুতন নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ বছরের পরীক্ষাটা এক বছরে সেরে ফেলার দাবি করে ওঁর সরকারকে একশোতে একশো দিচ্ছেন কেন? আবার একই প্রশ্ন শুনে তৃণমূলের লোকেরা হয় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে না হয় অপ্রাসঙ্গিক কিছু একটা বলে কেটে পড়ে রক্ষা পাচ্ছে।

মোট কথা ক্ষমতাসীন দল বলে উপর উপর দাদাগিরি করলেও এক ধরনের অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের। কারণ মমতা যাই বলুন, আর যাই করুক না কেন, সিপিএম পার্টির নির্দেশের মতো সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার নেত্রী কাউকেই দেননি। শুধু সরকারি কাজকর্ম নয়, দলেও যে কখন যে কি সিদ্ধান্ত হবে কে বসবে কে উঠবে বামেদের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারি সংস্থা পলিটব্যুরোর মতো সর্বশক্তিমান দিদি ছাড়া কেউ জানে না।

উদাহরণ হিসেবে উত্তরবঙ্গের কথাই ধরা যাক। ব্যক্তি হিসেব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিরিখে শিলিগুলির গৌতম দেবের যা যোগ্যতা তাতে শিলিগুড়ির মানুষ ও মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরাও নাকি বুঝে উঠতে পাচ্ছেন না কিভাবে এই মানুষটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্ব পেয়ে এতটা উপরে উঠে গেলেন। মির্জা আজগর সুলতান নামক মুখ্যবনপালের সঙ্গে বিবাদ সত্ত্বেও আপাদমস্তক বামপন্থী সুযোগ-সন্ধানী নব্য তৃণমূলী হিতেন বর্মনের বনমন্ত্রিত্ব খোয়া গেল না। অথচ ঠিক একই আচরণের কারণে অর্থাৎ এনবিএসটিসির এক শীর্ষ আমলার সঙ্গে বিবাদের জেরে 'কোচবিহারের মমতা' রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে অত্যন্ত অসম্মানজনক ভাবে এই সংস্থার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরতে হলো। শোনা যায় মমতা ছাড়াও মুকুল রায়ের গুড বুকে না থাকলে নাকি তৃণমূলে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী হয়েই থাকতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমজনতা অনুভব করুক আর না করুক সরকারের এই 'সাফল্য' প্রচারে মমতা এতটা বেপরোয়া কেন? এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে বিপুল ভাবে জিতিয়ে আনার জন্য ওঁর সরকারের একটি উন্নয়ন পাগল ও মুসলিম দরদী ছবি তৈরি করতে হবে। এটা বোধহয় এইজন্যই যে মমতার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে মুসলমানরাই এরাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারক।

সুতরাং সর্বাগ্রে ওদের খুশি করতে হবে। সে জন্য মমতা এটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে যে সংখ্যালঘু তকমার আড়ালে মুসলমানদের জন্য যা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একশো শতাংশেরও বেশি কাজ করে ফেলেছেন।

দুই, পাগলের চিকিৎসা করতে করতে অনেক ডাক্তার নাকি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। ঠিক সেরকম বামেদের মোকাবিলা করতে করতে মমতার মধ্যে হয়তো ওদের অনেক বৈশিষ্ট্যই প্রবেশ করেছে। যেমন, তিল কে তাল করতে, অর্ধসত্য বা মিথ্যাকে সত্য বানাতে গোয়েবলসিয় প্রচারের পারদর্শিতায় বামেরা অদ্বিতীয়। হতে পারে বামেদের দেখানো পথেই মমতা রাজ্যের বিরোধীদের মোকাবিলা করতে চাইছেন। সে জন্যই হয়তো সামান্য কিছু রুটিন কাজ ও ঘোষণাকে ঘিরে পাঁচ বছরের কাঁজ পাঁচ মাসেই করে ফেলার তত্ত্ব জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ছবিসহ ফ্লেক্স, পোস্টার, বিজ্ঞাপন ও মিছিল, মিটিং, মেলার আয়োজন করে বর্তমান সরকার সেই বামেদের মতো গোয়েবলসিয় ধাঁচের প্রচারের অস্ত্রকেই মোক্ষম বলে ধরে নিয়েছে। বাজেটে সরকারের ঢাক পেটানোর জন্য আর্থিক দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরাদ্দ এ বছর এক লাফে ৬১ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১১০ কোটি টাকা করে দেওয়াই বোধহয় একথার বড় প্রমাণ।

মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণে প্রায় পঞ্চাশজন স্মরণীয় বরণীয় মানুষের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছেন। রাজ্যজুড়ে পালিত এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সংশ্লিষ্ট মহামানবদের কথা কতটা উচ্চারিত হচ্ছে বলা না গেলেও বামেদের ধারা অনুসরণ করে নিজেদের সরকারের ও দলের মাহাত্ম্য প্রচার অর্থাৎ মমতাস্তুতিতে কোনও ঘাটতি থাকছে না।

সবমিলে বলা যায় উন্নয়ন নিয়ে নানারকম তরজা চলতেই থাকবে। তবে বর্ষপূর্তিতে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করলে বলতে হবে মমতা ও তার পরিবর্তনের সরকার এখনও বাম সংস্কৃতির দুষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পার্থক্য এইটুকুই যে বাম আমলে পার্টির আজ্ঞা ছাড়া সরকার নামক ব্যবস্থাটি এক চুলও নড়তো না আর এখন ব্যক্তি মমতার নির্দেশ ছাড়া তা হয় না। অর্থাৎ বাম আমলে কায়েম হওয়া পার্টি বা ব্যক্তির আজ্ঞাবহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখনও এরাজ্যে বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছে। ৩৪ বছরে বামেরা এ রাজ্যের মানুষের মূল্যবোধের ধারা এতটাই নিম্নগামী করেছে যে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়। মমতা ক্ষমতায় অভিষিক্ত হওয়ার প্রথম বছরেই নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ছুতোয় মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়-কে রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে সেখান থেকে ফিরে আসা বা এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণাম থেকে এ রাজ্যকে বাঁচানো সহজ কথা নয়। খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হবে ব্যক্তি মমতা সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী হলেও নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপের নিরিখে বামেদের সঙ্গে মমতার পার্থক্য সামান্যই।

জল নিয়ে যন্ত্রণা

নবকুমার ভট্টাচার্য

১৮৯০ সালে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর স্বাস্থ্য বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ছিল— 'গ্রামে গ্রামে মড়ক নিবারণার্থে রক্ষাকালী পুজোয় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে ওই অর্থে পানীয় জলের সংকট মোচনের জন্য অনেকগুলি পাতকুয়া কাটা যাইতে পারে— ব্যাখ্যা লিখ।' এই কথাটার ব্যাখ্যা আজও কি আমরা দিতে পারছি? গ্রামে গ্রামে জল সংকট বাড়ছে। এই মুহূর্তে এগারোটি জেলা সংকটে। জল দূষিত হচ্ছে। আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ ছড়িয়েছে বহু জেলায়। আজ অনেক গ্রামেই কুয়ো নেই। টিউবওয়েলেও অনেক জায়গায় গ্রীষ্মে জল ওঠে না। দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অথবা উত্তর ২৪ পরগণার অনেক অঞ্চলে গরমের দিনে শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের মাঝখানে টিউবওয়েল বসিয়ে জল তুলতে হয়। কেন এমন হচ্ছে? খবরে প্রকাশ মাটির তলা থেকে যথেচ্ছ জল তুলে ফেলায় পশ্চিমবঙ্গের ৬৮টি ব্লককে 'কালো তালিকা'য় অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় ভূজল পর্ষদ অর্থাৎ সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড। বস্তুত এই ব্লকগুলোর ভূগর্ভের জলের সঞ্চয় কার্যত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নদীমাতৃক এলাকা হওয়া সত্ত্বেও গত এক দশকে রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ২৭৫ টি ব্লকেই ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত জল তুলে ফেলা হয়েছে। নগরায়ণ ও কৃষি কাজে অপরিকল্পিত ভাবে বাড়তি জল ব্যবহারের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে আগামী কুড়ি বছরে ভূগর্ভস্থ জলস্তর আরও নেমে যাবে। এর মধ্যেই বর্ধমানের ১০টি, মুর্শিদাবাদের ২২টি, নদীয়ার ১৪টি, বীরভূমের ৭টি, পশ্চিম মেদিনীপুরের ৮টি, মালদহের ৫টি ও হুগলীর ২টি ব্লক শুখা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

> "ভূগর্ভের জল বেপরোয়াভাবে তোলা অবিলম্বে বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গ খুব তাড়াতাড়ি মরুভূমিতে পরিণত হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১১টি জেলা সঙ্কটের মধ্যে। রাজ্যের ৬৮টি ব্লককে ধূসর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানকার মাটির তলার জল তোলা যাবে না। ৬১টি ব্লকে জল তোলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ৬০টি ব্লকের জল লবণাক্ত।"

মধ্যযুগে মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবীর কেন্দ্রে জলের একটি অনন্ত উৎস রয়েছে। নদীসমূহ সেখান থেকেই জল বয়ে আনে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডমন্ড হ্যালি ভূমধ্যসাগর অভিমুখী নদীগুলিতে প্রবাহিত জলের একটি হিসেব নেন। তারপর ওই অঞ্চলে সামগ্রিক বৃষ্টিপাতের একটি হিসেব নেন। দেখা গেল এই দুটি হিসেবের মধ্যে প্রায় কোনও ফারাক নেই। ঠিক এই সময়েই ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লদপেরাউন্ট শোন নদীর জলের হিসেব করে দেখলেন ওই অঞ্চলের সামগ্রিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় তা যথেষ্ট কম। বাষ্পীয়করণ এবং ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারের রহস্য এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবী এবং আবহাওয়ার মধ্যে জল বিনিময়ের সূত্রটি কাজ করে চলেছে এভাবেই। এ পৃথিবীর আদিমতম পর্বতে প্রথম জলের ফোঁটাটি পড়েছিল সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে। যদিও প্রথম সেই জল স্পর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন তৃষিত এই গ্রহের মাটিতে বছরে ৮২ মিলিয়ন একর ফুট বৃষ্টিপাত ঘটে। যদি এই বৃষ্টিপাত ও বরফ যথার্থভাবে সঞ্চয় করে রাখা হয় তাহলে ১৪৬ ট্রিলিয়ন মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ অতি সহজেই হতে পারে। জনবিস্ফোরণ এখনও এই সংখ্যাটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে। তবু তৃষ্ণার অন্ত নেই। মৌসুমী এশিয়ার দেশসমূহের নগ্ন করতলে রয়েছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ— জল। মৌসুমী নিজেই তা বহন করে

আনে। মৌসুমীর গর্ভসঞ্চার ঘটে থাকে প্রধানত সামুদ্রিক জলেই। পৃথিবীর মোট জলের ৯৭ ভাগই ধারণ করে আছে সমুদ্র। আকাশ নির্ভর এই জল বন্টন ব্যবস্থার দাসত্বের শিকার হয়ে রয়েছি আমরা। যদিও সুবিশাল এই ভূখণ্ডে জলের বন্টন বড়ই এলোমেলো, অসম। তাই কোথাও অনাবৃষ্টি আবার কোথাও অতিবৃষ্টির এক পোষণ যন্ত্রে নিয়তই পীড়িত আমরা। আমাদের সমস্যা এই নয় যে জল নেই। আমাদের সমস্যা হলো জলের উপর আমাদের ভরসা করার মতো কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। একারণেই এখনও ভারতবর্ষে রাজনীতির মহার্ঘ্য ঘুঁটি হচ্ছে জল। ভোটের একটি চৌকো বাক্সকেন্দ্রিক রাজনীতির মুখ্য স্রোত থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জল নিয়ে এক মহাশোরগোল ওঠে। এখন তো আবার নদীর জল নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই। 'সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল' এই শতাব্দীর শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মিলছে কি? রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর সবদেশের সকলের জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে পৃথিবীর এক বিলিয়নের বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে চারজন মারা যায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে। যদি পৃথিবীতে প্রাপ্ত জলের সবটাই ব্যবহার উপযোগী হোত তবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ দৈনিক ১৯০০ লিটার করে জল পেতেন। বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যায় জল অপ্রতুল হোত না। জলাভূমি রক্ষার আইন হলেও আইনের ফাঁক রয়ে গিয়েছে বহু। ওয়ার্ল্ড লাইফ ফান্ড (WLF) তার সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্টে বলেছে— পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি বিশেষত আমেরিকা জলসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যে পরিমাণ আহরণ করছে তাতে অচিরেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ জল প্রাণ পালয়িত্রী। রাষ্ট্রসংঘের জল সম্মেলন (United Nations Water Conference) ১৯৭৭ সালে বিশ্বের সব মানুষের জন্যে পানীয় জল ও শৌচাগারে ব্যবহারের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছিল। ১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের Commission on sustainable development-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে পৃথিবীব্যাপী উন্নয়নের সঙ্গে স্বাদুজলের ব্যবহার ও ভবিষ্যতে জলের পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ২০০৮ এর একটি হিসাব বলছে ১৯৮০ পর থেকে ভারতে কয়েক বছরে ১০ লক্ষ করে নতুন নলকূপ বসেছে। অর্থাৎ মোট প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ। সেচভুক্ত জমির আয়তন এর ফলে দ্বিগুণ হয়েছে বটে কিন্তু এগুলি বছরে প্রায় ২৫০ ঘন কিলোমিটার জল মাটি থেকে শুষে নিচ্ছে। বৃষ্টির জল ৬০ শতাংশ ফিরিয়ে দিতে পারে কিন্তু ১০০ ঘন কিলোমিটার ভূমি জল অপূরিত থেকে যাচ্ছে।

১৯৯৪-এর পর আরও অনেক বছর কেটে গিয়েছে। তার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। শিল্প ও কৃষির প্রসার ঘটেছে, জলের চাহিদা বেড়েছে কিন্তু বাড়েনি স্বাদুজল। বরং অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ফলে জল দূষণে স্বাদুজলের পরিমাণ ক্রমশ কমেছে। যদিও বিষয়টি আমাদের সচেতন করেনি। কারণ জল সম্পর্কে আমাদের ধারণার গোলমাল রয়েছে। আমরা মনে করি— মাটির নিচের ভাণ্ডারের জল ও নদীর জল কখনও শেষ হতে পারে না। যেভাবে ব্যবহার হোক না কেন জলের গুণমান একই থাকে, জলের কোনও দাম নেই। তাই যথেচ্ছ ভাবে জল ব্যবহার ও অপচয় করা যায় এবং মাটির তলা থেকে জল তুললেই সমস্যা সমাধান করা যায়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। মাটির তলার জল যথেচ্ছ তোলার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। বিজ্ঞানীরা বহুবার সতর্ক করলেও সেসব কথা শোনা হয়নি। সবজান্তা বাঙালি আর তাদের নেতারা উড়িয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীদের যাবতীয় সতর্কবার্তা। অথচ বিজ্ঞানীরা বলছেন— ভূগর্ভের জল বেপরোয়াভাবে তোলা অবিলম্বে বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গ খুব তাড়াতাড়ি মরুভূমিতে পরিণত হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১১টি জেলা সঙ্কটের মধ্যে। রাজ্যের ৬৮টি ব্লককে ধূসর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানকার মাটির তলার জল তোলা যাবে না। ৬১টি ব্লকে জল তোলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ৬০টি ব্লকের জল লবণাক্ত। অপরদিকে মাটির উপরে বন্যার জল সমস্যার সৃষ্টি করছে প্রতিবছরই। অতি বর্ষণের ফলে বাড়তি জল কোনও ভাবে ধরে রাখা বা নদী-নালা, পুকুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। নদীনালা পুকুর সব জায়গাতেই আজ পলি পড়ে জমে গেছে। পলি কাটার ব্যবস্থা নেই।

কোথাও নদী বেঁধে মাছ চাষ হচ্ছে, কোথাও আবার পাকাঘর বানিয়ে ফেলা হয়েছে নদী বুজিয়ে। বড় বড় জলাশয়, দীঘিগুলি আজ কংক্রিটের লোভের তলায়। কাঙালের লক্ষ্মীলাভের মতো প্রমোটারের রমরমা এখন। মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা পরিশুদ্ধ জলও কি পাওয়া যাবে কিছুদিন পরে?

১৯৫৫ সালের হিসেবে প্রতিজন ভারতবাসীর সারা বছরের জন্যে ব্যবহার উপযোগী জল ছিল ৫২৭৭ ঘন মিটার, ১৯৯০ সালে সেটা কমে হয় ২৪৬৪ মিটার আর ২০০০ সালে তা আরও কমে হয় ১৯৪৭ ঘন মিটার। ২০০৭ সালে তা আরও কমে হয়েছে ১৫০৭ ঘন মিটারে। এভাবে কমতে থাকলে ২০২৫ সালে মাথাপিছু জলের পরিমাণ হাজার ঘন মিটারের চেয়ে কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মূল সঙ্কটের গতি প্রকৃতি দেখে মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার, ভূপৃষ্ঠের জলের দূষণ এবং জলের অপচয়— এই তিনটি ক্ষেত্রকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে যে পরিমাণ জল খরচ হয় তার ৮০ শতাংশ ভূগর্ভের জল। শহরে এর পরিমাণ ৬০ শতাংশ। আমাদের রাজ্যে নদীর জল পানীয় হিসেবে শুধু শহরাঞ্চলে কিছু ভাগ্যবান মানুষ ব্যবহার করেন, রাজ্যের জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামে থাকেন, তাঁদের পানীয় জল আসে মাটির নীচ থেকে। আমাদের দেশের বহু স্থানেই ১৯৮০ সালের তুলনায় জলস্তর চার মিটার বা তারও বেশি নিচে নেমে গিয়েছে। ভারতের ৩৪০০টি ব্লকে ব্যবহার উপযোগী ভূগর্ভস্থ জল রয়েছে। তার মধ্যে ২৪৯টি ব্লক সব জল খরচ করে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। এইসব ব্লকগুলি অধিকাংশই পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান ও গুজরাতে। দিল্লীসহ ১৯টি বড় শহরের জলের অভাব প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। কলকাতাও নির্জলা হতে চলেছে। গত তিরিশ বছরে কলকাতার ভূপৃষ্ঠের জল তোলা হয়েছে হু হু করে। শহরে বিভিন্ন বহুতলে বসানো গভীর নলকূপ ফাঁকা করে দিচ্ছে ভূগর্ভের জল ভাণ্ডার। এর ফলে জলের তল নেমে গিয়েছে প্রায় তিরিশ ফুট। এটা কোনও গল্প কথা নয়। কয়েক বছর পূর্বেই এ তথ্য দিয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব বেঙ্গল বেসিন। ফলে ফাঁকা হয়ে গেছে কলকাতার

জলস্তর। কলকাতা যেহেতু গঙ্গা ভাগীরথীর ব-দ্বীপ অঞ্চল তাই ভূতাত্ত্বিকরা একে বলেন কোয়ারটারনারি পর্ব, সে পর্বে জমা হওয়া পলি দিয়ে তৈরি এই শহর। এই শহরের মাটির ঠিক নিচে রয়েছে কাদামাটির স্তর। এটা কোথাও ৩০ মিটার আবার কোথাও ৬০ মিটার পর্যন্ত গভীর। এর পরেই রয়েছে আর একটা স্তর যেটা মূলত কাদামাটি আর বালির চাদর দিয়ে তৈরি। এটার গভীরতা মাটির ওপর থেকে ২৯৬ থেকে ৪১৪ মিটারের মধ্যে। মাটির নিচে থাকা কাদামাটির দুটো স্তরের মধ্যে জলের স্তর রয়েছে। যে স্তরে জল আছে সেটা মূলতঃ বালি আর নুড়ি দিয়ে তৈরি স্তর। ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন কলকাতায় ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, কসবা এলাকায় একটা অগভীর স্তর রয়েছে। আবার পশ্চিমে গার্ডেনরিচ বড়িশা অঞ্চলে মাটির ১৬০ মিটার নিচে রয়েছে ভাল জল। তার ওপরেও জল রয়েছে কিন্তু সেটা লোনা। এই জলস্তর বিস্তৃত হয়েছে পূর্বদিকে যাদবপুর কসবা অঞ্চলেও। যাদবপুরের কাছেই গড়িয়াতে ৬০ থেকে ১০০ মিটার গভীর জলস্তর মিলবে। কলকাতার গভীরতর জলস্তরে জল ঢোকে শহরের উত্তরদিকের কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী বা রাণাঘাট এলাকা এবং পশ্চিমের তারকেশ্বর পান্ডুয়া এলাকার মাটি চুঁইয়ে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে পরিমাণ জল আমরা তুলে নিচ্ছি মাটির নিচের জলস্তর থেকে সে পরিমাণ জল পৌঁছচ্ছে না মাটির নিচে।

কলকাতা শহর ক্রমশই বেড়ে চলেছে— তাই বেড়ে চলেছে পানীয় জলের চাহিদাও। যেহেতু নদীর জল পরিশোধন করে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে অনেক অর্থ খরচ তাই ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। কলকাতা শহরের পাশে বেড়ে ওঠা বিধাননগর, রাজারহাট নিউটাউন এবং হাওড়া উপনগরীতে তাই পানীয় জল যোগানের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার ক্রমশই দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে নগরায়ণের ফলে বৃষ্টির জল মাটির নিচের জলস্তর সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। একদিকে ক্রমবর্ধমান ভূগর্ভস্থ জলের চাহিদা ও অন্যদিকে এই ভূজলের ঘাটতি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এমন দিন আসতে চলেছে যখন আর ভূগর্ভস্থ জল মিলবে না।

কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে কলকাতা শহরের ভূ-জল বিন্যাসকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি অংশ হলো উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, মধ্যও দক্ষিণ অঞ্চল। উত্তর অঞ্চলে ৩৮ থেকে ৫৮ মিটার কাদামাটির নিচে এক বৃহৎ জলস্তর প্রায় ২০০ মিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলস্তরের ক্রমরেখা অবস্থান করছে ১৪ থেকে ১৭ মিটার গভীরে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাশের সন্নিহিত অঞ্চলে মিষ্টি সুস্বাদু জলস্তর মাটির নীচে ৫০ থেকে ১৩৫ মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্রমরেখা ৯ মিটার থেকে ১৫ মিটার গভীরে। যদিও এখানে জায়গায় জায়গায় ভূজলের গুণগত মানের সমস্যা রয়েছে। ওইসব স্থানে জল প্রায় লবণাক্ত। পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ তারাতলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জলস্তর পাওয়া যায়। যা ৬৫ থেকে ১৫৫ এবং ১৮৫ থেকে ২৬৫ মিটার গভীরে বিস্তৃত। এর মধ্যে প্রথম জলস্তরটি লবণাক্ত। সুস্বাদু মিষ্টি জলের জলস্তর সাধারণত ১৬৫ থেকে ২৬৫ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জলস্তরের ক্রমরেখা ১৮ থেকে ২০ মিটার গভীরে অবস্থিত। মধ্যাঞ্চলে অর্থাৎ বিবাদীবাগ, ধর্মতলা, পার্কস্ট্রিট, পার্কসার্কাস, লোয়ার সার্কুলার রোড প্রভৃতি অঞ্চলে মিষ্টি সুস্বাদু জলের সন্ধান মেলে ৮০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতায়। এখানে জলস্তর প্রায় ১৮ মিটার নীচে। গত পনেরো বছরে অনেক বেশি মাত্রায় জল উত্তোলনের ফলে এখানকার জলস্তর প্রায় ১৫ মিটার নীচে নেমে গেছে। দক্ষিণ অঞ্চলে কোথাও মিষ্টি জল আবার কোথাও জল প্রায় লবণাক্ত। এই অঞ্চলে জলে আয়রণের পরিমাণও বেশী। এখানেও অতিরিক্ত জনবসতির ফলে ভূজলের ব্যবহার বেশী। তাই এই অঞ্চলের জলস্তর গত দশ বছরে ১০ মিটার নীচে নেমে গেছে। হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে কলকাতা শহরে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৭৫ মিলিয়ন গ্যালন জল তোলা হয়ে থাকে। এই জল তোলা হয় নলকূপের সাহায্যে। নলকূপগুলিতে যন্ত্রচালিত টারবাইন বা সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যেও নলকূল থেকে জল তোলা হয়। কলকাতা শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকণ্ঠে দ্রুত নগরায়ণ হওয়ার ফলে ভূজল ব্যবহারের পরিমাণও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এতে ভূজল ভাণ্ডারের টান পড়েছে। অবৈজ্ঞানিক ভাবে মাটির নিচের জল তোলা কমিয়ে ফেলতে রাজ্য সরকার বা পুরসভার আইন করা উচিত ছিল কিন্তু সেরকম কিছু চিন্তা ভাবনা হয়নি। রাজ্য সরকারের জল সম্বন্ধে কোনও নীতিই নেই। প্রকৃতির দয়ায় আমরা প্রতি বছর যে জল পাই তার পরিমাণ হল ১২.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। এর থেকে ৩.৪২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাটির নীচে প্রবেশ করে আর ৮.০৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার বাষ্পীয়করণের মাধ্যমে বাতাসে ফিরে যায়। ২০০১ সালে আমাদের রাজ্যে জলের চাহিদা ছিল ১০.৬১ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। ২০১১ সালে ওই চাহিদা বেড়ে হবে ১৪.৩২ মিলিয়ন হেক্টর মিটারে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের জলের চাহিদা জোগানকে অতিক্রম করবে। অথচ এরাজ্যের জলাভূমির অবস্থাও তথৈবচ।

জলাভূমির সংখ্যা ও আয়তন কত তা আলাদা করে নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯০ এর দশকের গোড়া থেকে। ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক উপগ্রহ থেকে পাঠানো তথ্যের সাহায্যে জলাভূমির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO)-র অন্তর্গত আমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (SAC)-র উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। এঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতবর্ষে জলাভূমির পরিমাণ হচ্ছে ৪.১ মিলিয়ন হেক্টর। ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর হচ্ছে প্রাকৃতিক ও ২.৬ মিলিয়ন হেক্টর মনুষ্যকৃত। বাদাবনের পরিমাণ হচ্ছে ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে পৌর এলাকাসহ গ্রামীণ এলাকায় ২.৫ হেক্টরের কম আয়তনের প্রচুর বিলসহ জলাভূমি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে সুন্দরবন, মিরিকলেক, কোচবিহারের রসিক বিল, উত্তর দিনাজপুরের কুলিক, বর্ধমানে পূর্বস্থলির চুনিচর, হুগলীতে সবুজ দ্বীপ, কলকাতার বিজ্ঞাননগরীর পাশে নলবন, রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবর, মুর্শিদাবাদের আহিরণ ঝিল, মতিঝিল, হাওয়ার সাঁতারাগাছি ঝিল প্রমুখ। এই সমস্ত জলাভূমি জলচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি কার্বণচক্র, নাইট্রোজেন চক্র নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূর্যালোকে জলাভূমিস্থ সবুজ

শৈবাল এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থগুলির উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষণ করে বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। জলাভূমির জল মাটির ভিতর দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল স্তরের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। জলাভূমির সবুজ শৈবাল ও জলাভূমিস্থ উদ্ভিদ বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড সহ অন্যান্য দূষিত গ্যাস ও ধূলিকণা শোষণ করে। জলাভূমির উদ্ভিদ তরল বর্জ্য পদার্থকে পরিশোধন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলাভূমির উদ্ভিদ ভূগর্ভস্থ জল দূষণ রোধ করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমির জলাঞ্জলি পর্ব চলছে এখন। শিল্পোন্নয়ণের নামে যততত্র জলাভূমি বোজানোর কাজ চলছে। আইন বলে, কোনও জলা জমিই বোজানো যাবে না। কিন্তু সেই আইনকে তুড়ি মেরে সরকারই দিব্যি বন্টন করে দিচ্ছে জলা। এইসব নানা সমস্যায় ভূগর্ভস্থ জলের ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে ভূগভের জলের মানেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটছে। রাজ্যের অধিকাংশ এলাকার জল লৌহ দূষিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের ৬০টি ব্লক লবণাক্ত হিসেবে চিহ্নিত। তাই রাজ্যের ১০টি জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। রাজ্যে ৩০০০ গ্রাম আর্সেনিকে আক্রান্ত। আর্সেনিক যুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন ৭০ লক্ষ মানুষ। এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত মোট আক্রান্ত মানুষ প্রায় চার লক্ষ।

আর্সেনিক এলো কোথা থেকে? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাঙ্গেরির একদল গবেষক বিজ্ঞানী মনে করেন বহুকাল ধরে আমাদের কৃষি জমিতে যে সার এবং কীটনাশক বা পোকা মারার বিষাক্ত বিষ ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আর্সেনিক থাকে। পরে জমিতে তা ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে আস্তে আস্তে তা ভূগর্ভে পৌঁছে যায়। কারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকেও আর্সেনিক আসতে পারে। যেমন বেশ কিছুকাল পূর্বে কলকাতার বেহালার কাছে একটি প্যারিস গ্রিণ প্রস্তুতকারী কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল জল দূষণের। এই কারখানার বর্জ্য যেখানে পড়ত সেখানে মাটির নিচের জলে দূষণ ঘটত। এছাড়া নানা কারখানার বর্জ্য বৃষ্টির জলের সঙ্গে সঙ্গে চুঁইয়ে মাটির নিচে চলে যায়। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আজ যেসব টিউবওয়েল তৈরি হচ্ছে, সেই টিউবওয়েলগুলির বেশিরভাগই ১৫০ থেকে ২০০ ফুট গভীর থেকে জল তোলে। ভূগর্ভের এই স্তরে আর্সেনিক থাকার সম্ভাবনা প্রবল। চাষের জমিতেও এখন এই সব সময়েই নলকূপের জল সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে আর্সেনিক সমৃদ্ধ থেকে নলকূপের সাহায্যে যত জলসেচের কাজে ব্যবহার করা হয় তাতে আর্সেনিকের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। স্বভাবতই ওই জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে আর্সেনিক থাকবে। বেশি গভীর টিউবওয়েল তৈরির খরচ বেশি বলে কেউ তা তৈরি করে না। যদিও আর্সেনিক মুক্ত জলের জন্য বিদেশ থেকে টাকা আসছে, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে নানা প্রস্তাব দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বেঙ্গল বেসিন। তবু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

জল দূষণ নিয়ে রাজ্যে ১৯৮৮ সালে সরকার একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে। ১৯৯১ সালে সেই কমিটি একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে— কেবলমাত্র গভীর নলকূপের জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিটি টিউবওয়েল বসানোর পূর্বে সেই জল পরীক্ষা করে দেখার

“রাজ্যের অধিকাংশ এলাকার জল লৌহ দূষিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের ৬০টি ব্লক লবণাক্ত হিসেবে চিহ্নিত। তাই রাজ্যের ১০টি জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। রাজ্যে ৩০০০ গ্রাম আর্সেনিকে আক্রান্ত। আর্সেনিক যুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন ৭০ লক্ষ মানুষ। এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত মোট আক্রান্ত মানুষ প্রায় চার লক্ষ।”

সুপারিশ ছিল ওই রিপোর্টে। কিন্তু এ রাজ্যে কোনও পরীক্ষা না করেই জল ব্যবহার হচ্ছে। আর্সেনিক জল পান করার ফলে যে রোগগুলিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তা হলো প্রথমে চমড়ার অসুখ তারপর তা থেকি স্কিন ক্যানসার। অ্যানিমিয়ার মতো রক্তাল্পতার দুর্বলতা হতে পারে। ফুসফুসে সংক্রামক ঘটছে বহু মানুষের। জলে আর্সেনিক রয়েছে কিনা আপনি আমি তা বুঝতে পারি না। কারণ খালি চোখে আর্সেনিক দেখা যায় না।

আর্সেনিক শরীরে ঢুকলে গোটা গায়ে ছোপ ছোপ হয়ে যায়, পরে তা ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়। পেটের দীর্ঘস্থায়ী গোলমাল দেখা দিতে পারে। ডাক্তারী মতে আর্সেনিক আক্রান্ত হবার পরে ঠিক সময়ে ধরা পড়লে তা সেরেও যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে এ রাজ্যে প্রথম আর্সেনিক দূষণের সন্ধান মেলে। ১৯৮৩ সালে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে প্রথম রোগী পাওয়া যায়। মাটির নীচের জল দূষণ থেকে যে এই রোগ, তখনই তা প্রমাণিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জলে লিটার প্রতি ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিকের উপস্থিতি আশঙ্কার কারণ। লিটার প্রতি ৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত জল ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ধরা হয়। তার বেশি থাকলে তা ক্ষতিকর। পশ্চিবঙ্গের যে জেলাটি সবচেয়ে বেশি আর্সেনিকের কবলে আক্রান্ত তা হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা। এরপর রয়েছে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগণা। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির তথ্য অনুসারে জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ১৯টি ব্লকই স্থান করে নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লিটার প্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে ১৯টি ব্লকের গ্রামের জলে। লিটার প্রতি ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে ২২টি ব্লকের গ্রামের জলে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলায় সেচের জলে আর্সেনিকের পরিমাণ রয়েছে লিটার প্রতি ০.০৬ থেকে ০.০৪ মিলিগ্রাম। আর্সেনিকের হাত থেকে বাঁচতে এবং ভূগর্ভে জলস্তর হ্রাস রুখতে প্রথম প্রয়োজন জল সংরক্ষণের। প্রসঙ্গত জলের অপচয়ের দিকটিও বিচার্য। যেসব অঞ্চলে জলের প্রাচুর্য ও পর্যাপ্ত সরবরাহ— সেখানে জলের অপচয়ও বেশি। কলকাতা পুরসভার রাস্তার কলগুলিতে যে হারে জল অপচয় হয় তা রোধ করা প্রয়োজন। এছাড়াও বৃষ্টির জল যাতে বেশি করে ধরে রাখা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য গ্রামে কয়েকটি পরিবার মিলে বড় জলাধার তৈরি করা যেতে পারে। এখন বাজারে নানা কোম্পানির জল পরিশোধন যন্ত্র পাওয়া যায়। ওই যন্ত্র কিনে জল শোধন করে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ইনস্টিটিউট অফ ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি বসানো (Roof top Rain Water Harvesting System) হয়েছে। এই জলাধারগুলি রয়েছে— কিশোর ভারতী আশ্রম, বাঘমুন্ডি পুরুলিয়া, কামারডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় বীরভূম, লতাবনি প্রাথমিক বিদ্যালয় বীরভূম প্রভৃতি স্থানে।

পৃথিবী জুড়ে পত্রে পুষ্পে শস্যে প্রতিনিয়ত যে প্রাণের প্রকাশ জলই তার স্তন্যদায়িনী। তাই জল আর জীবন সমার্থক। জল আর রক্ত ও প্রায় সমার্থক। জলের অভাব জীবনকে সংকোচিত করে। আলো ঝলমল জল থেকে রং নিয়ে শিল্পীরা প্রতিফলনে মায়ালোক রচনা করেন। কিন্তু এখানে জল নেই, শুধু পাথর আর বালিধূসর পথ। জলকরের অত্যাচারে কেবল অশ্রুবিন্দুটুকুই সম্বল— তাতেও যদি কর বসে!

নেত্রদান মহাদান

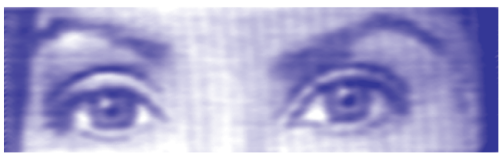

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

চিঠিপত্র

মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্যা

প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় দেখা যায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে ঘেরাও, মারামারি এবং গণ্ডগোলের চিত্র ও খবর। এক একটি কলেজে ৫০০০-রও বেশি ভর্তির ফর্ম পড়ে। প্রায় সপ্তাহ ধরে ফর্ম দেওয়া হয় ও আরও ৪/৫ দিন ফর্ম নেওয়া হয়। ছাত্র/ছাত্রী/অভিভাবকরা গলদঘর্ম হয়ে রোদে জলে ৪/৫ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম সংগ্রহ করে আবার আরেকদিন ওইভাবে ফর্ম জমা দেয়। তারপর এ কলেজ থেকে ও কলেজে ছুটে বেড়ায়, হয়রানির একশেষ।

কলেজেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই কাজে যুক্ত থাকে। ফলে অফিসের কাজ ও পড়াশোনার কাজ পুরোপুরি বিঘ্নিত হয়। সেই সময় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলে। তাতেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই পাঁচ হাজার ফর্ম, তার সঙ্গে মার্কশিট, অ্যাডমিটকার্ড, সার্টিফিকেটসহ এক বিশাল আয়তন হয়, এক/দুটি ঘর লাগে। এর মধ্য থেকে দু-একটি ফর্ম হারিয়ে যাওয়া বা অন্যস্থানে ঢুকে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, যা প্রায় হয়ে থাকে।

এবার সমস্ত মার্কস কম্পিউটারে তোলা এক গুরুভার কার্য। মানুষের দ্বারা কম্পিউটারে তথ্যনিবেশে ভুলের সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক। এই ফর্ম দেওয়া/নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে দুষ্ট যোগসাজস করে অন্যায় আর্থিক উপার্জনের সুযোগ থাকে।

এখন ব্লক টাউনেও সাইবার কাফে হয়ে গেছে। সেখানে গেলেই ছাত্ররা সামান্য আর্থিক খরচায় খুব সহজে একসঙ্গে অনেক কলেজের ফর্ম ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারে। এই অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারে নিবিষ্ট হয় এবং মেধা তালিকা তৈরি হয়ে যায়। মেধা তালিকায় তার স্থান তার মোবাইল এবং ই-মেল-এর মাধ্যমে অবগত হওয়া যাবে।

ফলে এই অনলাইন পদ্ধতিতে সময়-শ্রম-অর্থ সাশ্রয় করে স্বচ্ছভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভর্তি সম্পন্ন হবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও সবার স্বার্থে শিক্ষামন্ত্রককে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করি।

—অধ্যাপক নির্মল কুমার মাইতি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ, কলকাতা-৬।

পার্টিবাজি ও সেচের জল

আমি গড়বেতা ৩নং ব্লকের অধীনে ৫নং সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দ্বারিগেড়িয়া গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা।

আপনার অবগতির জন্য জানাই যে আমি একজন ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্তমানে মাঠে প্রায় তিন বিঘা জমিতে তিল চাষ করেছি এবং প্রায় দেড় বিঘা জমিতে বিভিন্ন রকমের শাকসব্জির চাষ করেছি। দ্বারিগেড়িয়া মৌজায় অবস্থিত যে সরকারী অগভীর নলকূপটি আছে তা থেকে অনান্য চাষীদের মতো আমার জমিতেও সেচ হয়। কিন্তু গত ৮ মে বিকাল ৪টার সময় আমি যখন জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য মাঠে যাই তখন যিনি ওই নলকূপটি পরিচালনা করছিলেন সেই মদন বাগ ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পবিত্র মণ্ডল, পিতা শ্রী অপূর্ব মণ্ডল আমাকে জানায় যে, 'তোমাকে বয়কট করা হয়েছে, তুমি জল পাবে না'। আমি এই বয়কটের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওঁরা বলেন যে তুমি বিজেপি কর তাই এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া বলেন যে তুমি রাহুল সিনহার জনসভায় গিয়েছিলে, অতএব রাহুল সিনহাকে জল দিতে বল। এরপর আমি লোকাল পুলিশ স্টেশনে ও ব্লক অফিসে গিয়ে ওঁদের জানানো সত্ত্বেও কোনও ফল পাইনি।

মহাশয়, আমি বহু ঋণ করে এই চাষ-আবাদ করেছি, আজ চারদিন আমার কপালে জল জোটেনি। এর ফলে লক্ষাধিক টাকার ফসল নষ্ট হতে চলেছে। এই ফসলগুলি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জল না পেলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। তৃণমূলী সরকারের কাছে কি এটাই কাম্য?

—সুকুমার দে, দ্বারিগেড়িয়া, ব্লক—গড়বেতা-৩, পশ্চিম মেদিনীপুর।

স্বাগত 'নবাঙ্কুর'

স্বস্তিকা-বুকে নবাঙ্কুর-এর
প্রবেশ দেখিয়া বাপন,
বলে, পত্রিকা ছিলো তো স্তুতির
আবার হইলো আপন।।
গৌরব বলে বলে সৌরভ
স্বাগত নবাঙ্কুর,
তোমার জন্যে জয়গীতি আজ
কান পেতে শোনো সুর,
সীতা, গীতা আর আরতির প্রিয়
দেখছি পড়ার ধূম,
প্রকাশিত হবে রাত্রি থেকেই
দেখছি হয় না ঘুম।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা।

আলুর কিলো ১০০ টাকা

আলুর কিলো ১০০ টাকা— এই দাবীটা শুনেই কেউ কেউ আঁতকে উঠবেন, এ আবার কী পাগলের প্রলাপ, হ্যাঁ, অনেক ভেবেচিন্তে, তুলনামূলক বিচার করেই উপরোক্ত দাবী। যারা অবাক হচ্ছেন বা অবাক হবেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন, আপনারা কেউ এ পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছেন কি কেন ১ লিটার বোতলের জল ১৫ টাকা। প্রশ্ন করেছেন কি কি যুক্তিতে ৩৭ গ্রাম আলুভাজা (যার গালভরা নাম পোটাটো চিপস্) ১৫ টাকা দাম। এছাড়াও আরও বহু নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী যথা--- খাদ্য-বস্ত্র-জুতা-প্রসাধনী-ঔষধ-ইমারত দ্রব্য-র লাগামছাড়া দাম যা কোনও যুক্তির ধার ধারে না। রাজ্যে বা কেন্দ্রে কোনও চক্ষুযুক্ত সরকার আছে বলে মনে হয় না। এরই নাম গণতন্ত্র? দেশের মধ্যে কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে না কেন? এক শ্রেণীর উৎপাদনকারী ব্যবসাদার প্রকাশ্যে গ্রাহকের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। উৎপাদন ব্যয় ও গ্রাহকের ক্রয়মূল্যের মধ্যে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট কোনও মাপদণ্ড নেই কেন?

সেক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে ও দুধ উৎপাদনে ফাঁকির কোনও সুযোগ নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং ক্ষমতার অধিক আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন করতে হয়। তাই ১ লিটার জল যদি ১৫ টাকা হতে পারে এবং ৩৭ গ্রাম আলুভাজা যদি ১৫ টাকা হতে পারে, তাহলে ১ কেজি আলু ও ১ লিটার দুধ ১০০ টাকা অবশ্যই হওয়া উচিত।

—অমরকৃষ্ণ ভদ্র, শিলিগুড়ি।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর ফতোয়া

দেবপ্রসাদ সরকার

হাবড়ার সপ্তগ্রাম হাইস্কুল মাঠে তৃণমূলের এক কর্মীসভায় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয় একেবারে অন্ধ তৃণমূলের সমর্থকের ন্যায় নিজ দলের ক্যাডার কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন যে, যে স্থানে সিপিএম থাকবে সেখানে যাবেন না, আপনাদের থাকাকালীন কোনও সিপিএম এলে স্থান ত্যাগ করবেন, কোনও প্রকার বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা চলবে না। তাহলে এর উত্তরে বলতে হয়, প্রকারান্তরে তিনি প্রত্যেক কর্মীদের অন্তরীণ হয়ে বাড়ীতে থাকার ফতোয়া জারি করছেন, সংবাদপত্রের উপর ম্যাডাম যেমন অর্বাচীনের ন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তেমন তিনিও ফতোয়া জারী করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগছে। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর নিকট রাখছি—

(১) প্রথমেই বলি, সিপিএমের ডাকসাইটে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মন্তেশ্বরের হেরো ব্যক্তি আবু আয়েশ মণ্ডল কি সাবান দিয়ে নিজ গাত্র মার্জনা করেছেন তিনি যে ম্যাডামের নজরে পড়ে তৃণমূলের সহসভাপতি হয়ে গেলেন?

(২) স্থানীয়ভাবেও দেখা গেছে পৌরসভায় মনোনয়ন দেবার ২/৩ মাস পূর্বেও কয়েকজন সিপিএমের হর্তাকর্তা ছিল, তবু তারা তৃণমূলের, বাহ্যিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে কাউন্সিলর হয়েছেন অন্তরে তরমুজের ন্যায় লাল রং বজায় রেখে। দিন দিন হুড়হুড় করে সাগরের ঢেউ-এর ন্যায় যেভাবে সিপিএম থেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য তৃণমূলের মতো রাজনৈতিক দলের কাছে আছড়ে পড়ছে, তারা তৃণমূলের কাছে স্বাগত আর বাকিরা ব্রাত্য!

(৩) খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় আরও বলেছেন চা-এর দোকানে সিপিএম থাকলে যাবেন না। আপনারা থাকাকালীন সিপিএমের কোনও ব্যক্তি গেলে আপনার চলে আসবেন। চা-দোকানী সিপিএম হলে কি করা উচিত সে সম্পর্কে কোন গাইডলাইন দেননি। মহাকরণের পাশের সিটে কোনও কর্মী সিপিএম সমর্থক থাকলে কি করা উচিত? মহাকরণ ত্যাগ করা উচিত না চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া উচিত? বিধানসভা চলাকালীন একই কক্ষে তো তৃণমূল, সিপিএম ও বামেরা সকলেই থাকেন। তখন কি জ্যোতিপ্রিয়বাবুদের

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

বামেদের সঙ্গে একই ছাদের নীচে একই ঘরে বসতে খারাপ লাগে না? তখন তো আপনারা বিধানসভা অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন না!

(৪) এবার আসি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যেটার উপর খাদ্যমন্ত্রী অধিকতর জোর দিয়েছেন। বলেছেন, বামেদের তথা সিপিএমের সমর্থকদের সঙ্গে কোনও প্রকার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না— কি ছেলে কি মেয়ে। তাহলে প্রশ্ন, সিপিএম থেকে যেসব সুযোগসন্ধানীরা বানের জলের মতো তৃণমূলে আসছে তাদের সঙ্গে ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দিলাম, স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে সেই ছেলে বা মেয়ের বাপ যদি আবার সিপিএম হয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে? একমাত্র পথ স্বামী'র স্ত্রী'র বা স্ত্রী'র স্বামী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা। তাহলে ডিভোর্স করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। আর সংবাদপত্রে রবিবার রবিবার যে পাত্রপাত্রীর কলম থাকে সেখানে বিজ্ঞাপনে অবশ্যই লিখতে হবে, পাত্রের ক্ষেত্রে— পাত্র পশ্চিমবঙ্গ, ইঞ্জিনিয়ার, দেবগণ, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা, বয়স ৩০ বৎসর। ফর্সা সুন্দরী কমপক্ষে গ্রাজুয়েট ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা বয়স অনধিক ২৪ বৎসর। যোগাযোগের ঠিকানা— মোবাইল নং....। এবারে ওর সঙ্গে যোগ করতে হবে, যাঁরা অবশ্য কট্টর তৃণমূলী তাঁরাই এটা যোগ করবেন, ছেলে বা মেয়েরা যদি সিপিএম হয় যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন! শেষের লাইনটি কঠোর ভাবে মানা হবে? এভাবেই বোধহয় এবার থেকে পাত্র-পাত্রী সংবাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে!

(৫) এবার আমি ধর্মের ব্যাপারে উল্লেখ করব, পূজা, নমাজ ঈদের ব্যাপারে কোনও মন্দিরে-মসজিদে যদি দেখা যায় সিপিএমের আধিক্য বেশী তাহলে কি সেখানে যাওয়া যাবে না? আর ধরা যাক, রেড রোড তথা মেয়ো রোডে নমাজ হচ্ছে। আপনার লাইনে সকলেই সিপিএম, তাহলে কি সেখান থেকে নমাজ ছেড়ে উঠে আসবে তৃণমূলী সমর্থক ধার্মিকগণ?

এত কথার অবতারণা করার প্রয়োজন হোত না যদি না আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্বাচীন খাদ্যমন্ত্রী এরকম একটি পাগলের ন্যায় বক্তব্য রাখতেন। এই ফতোয়া অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করি, ৩৪ বৎসরের দুঃশাসনের পর ব্যাঙাচির ন্যায় জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে চর্তুদিকে সিপিএম গিজগিজ করছে। তাদের সম্পর্কে না থাকতে হলে কোথায় যাবো বলতে পারেন মন্ত্রীমশায়? আপনার ও আপনাদের ম্যাডামের কি ভীমরতি মার্কা রোগে ধরেছে নাহলে এই প্রকার ভীমরতি মার্কা কথাবার্তা, যথা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা, কার্টুনিস্টের শাস্তির দাবি, সিপিএমের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ ইত্যাদি বলে চলেছেন!

কোথায় যাবো আমরা? পানের দোকান, বাজার, মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, সিনেমা, থিয়েটার, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়স্থান— কোথায় যাবো? পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় নরকে সিপিএম গিজগিজ করছে। অবশ্য স্বর্গে ওরা ওদের দুর্নীতির জন্য পাসপোর্ট পেয়েছে কিনা জানা নেই। মনে হয় স্বর্গটা এখনও তৃণমূলের।

পরিশেষে আমাদের রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়বাবুকে একটি 'অপ্রিয়' প্রশ্ন করি— তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী উনি যেটা বলেননি সেটা হলো সিপিএমের বাড়ি ডাকাতি, ওদের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ হলে কিছু করবেন না। আর একটি কথা— জ্যোতিনামের ব্যক্তিরাই কি সব সময়ে ভীমরতি মার্কা বক্তব্য রাখেন? জ্যোতি বসু থেকে জ্যোতি মল্লিক এরা মনে হয় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। সেই হারাধনের ছেলেদের মতোই হবে—

হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ-ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল রইল না আর কেউ।।

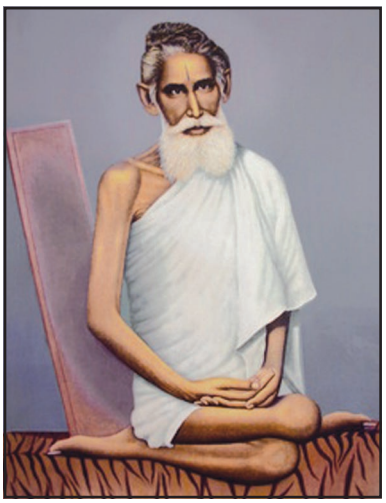

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুণ্যজীবন কথা

রবীন সেনগুপ্ত

পূর্ণব্রহ্মশক্তির্যথা লোকনাথে চ সংস্থিতা।
সর্বরূপং স্বরূপং ত্বং লোকনাথ নমাম্যহম্।।

লোকনাথবাবা ১৭৩০ খৃস্টাব্দে ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার চৌরাশী চাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘ ১৬০ বছর জীবিত থেকে ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরিত হন। এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় প্রায় ৯০ বছরই উনি কঠোর ব্রত উপবাস তপস্যা ভূ-পর্যটন ইত্যাদির পশ্চাতে অতিবাহিত করেন। লোকহিতের পিছনে উনি প্রায় বছর পঞ্চাশেক সময় প্রদান করেছিলেন।

শ্রীশ্রী লোকনাথবাবার পিতার নাম ছিল শ্রীরামনারায়ণ ঘোষাল, মাতা শ্রীমতি কমলা দেবী। রামনারায়ণের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁর একটা পুত্র যেন সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর বংশকে উদ্ধার করে। প্রথম তিন পুত্রের জন্মের পর চতুর্থ পুত্রকে দেখে তাঁদের কুলগুরু কচুয়ার শ্রীভগবান গাঙ্গুলী জানান যে অধ্যাত্মমার্গে মহাসফল হওয়ার সমস্ত সম্ভবনা এই নবজাতকের মধ্যে রয়েছে। গাঙ্গুলীবাবা এই পুত্রের নামকরণ করেন লোকনাথ। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো এগারো বৎসর বয়সে কিশোর লোকনাথের উপনয়ন হওয়ার পর প্রতিবেশীর পুত্র বেণীমাধবের সঙ্গে ভগবান গাঙ্গুলী তাদের সাধন শিক্ষার জন্য মহাপীঠ কালীঘাটে নিয়ে আসেন। সেখানে কিছুকাল সাধনা করে গভীর অরণ্যের এক স্থানে ভগবান গাঙ্গুলী তাঁর শিষ্যদ্বয়কে নিয়ে এসে আহার সংযমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নক্তব্রত শিক্ষা দেন। সারাদিন উপবাস করে রাতে খাদ্য গ্রহণের নিয়ম ছিল এই নক্তব্রতে। তারপর শুরু হলো একান্তরা ব্রত। ওই কিশোর বয়সে লোকনাথবাবা একান্তরা ব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে টানা তিন দিন উপবাস করে একদিন খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস করতে লাগলেন। তারপর শুরু হলো পঞ্চার্হ ব্রত। এতে পাঁচ দিন উপবাসের পর একদিন খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে হয়। তার পর একপক্ষকাল অন্তর খাদ্য গ্রহণ ও শেষে মাসার্হ ব্রতে টানা একমাস উপবাস করে খাদ্য গ্রহণের অনুশীলন করেন বাবা লোকনাথ। এমনি ভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলো। গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর বয়স একশ বছর পূর্ণ হলো। শিষ্য লোকনাথ ও বেণীমাধব টানা দুই মাস উপবাস শুরু করলেন। এই সময় লোকনাথজী জাতিস্মরত্ব লাভ করেন; অর্থাৎ নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করার ক্ষমতা লাভ করেন। গুরুর আদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য এবার হিমালয়ে গমনপূর্বক কঠোর সাধনা করতে থাকেন লোকনাথবাবা। ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁরা বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে কাবুলে তারপর কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন লোকনাথবাবা। সঙ্গে গুরুদেব ও বেণীমাধব। কাশীতে শিবকোটির যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে নিয়ে গিয়ে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তার দুই শিষ্যকে প্রদান করে দেহত্যাগ করলেন। এরপর ত্রৈলঙ্গস্বামীর কাছেই চলতে লাগল নানা ধরনের সাধন শক্তি অর্জনের প্রয়াস। বিশ্বভ্রমণ কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকার পর ত্রৈলঙ্গবাবার নির্দেশে আবার তা শুরু হলো। দেশের নানা অংশ ঘুরে লোকনাথজী পাকিস্তান আফগানিস্তান পারস্য বা ইরান হয়ে একেবারে পৌঁছে গেলেন আরবের মক্কা ও মদিনায়। সেখানে দীর্ঘজীবী ফকির আবদুল গফুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় লোকনাথজীর, আরব ছেড়ে সঙ্গী বেণীমাধবকে নিয়ে লোকনাথজী এবার প্রবেশ করলেন তুরস্কে। তুরস্ক হয়ে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে চলে এলেন তাঁরা। ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি দর্শন হলো। এমনকী বহু কষ্ট করে লোকনাথবাবা চির তুষারের দেশ সুমেরু অঞ্চলেও ভ্রমণ করে এলেন। তাঁরা এক সময় চীন দেশেও গমন করেছিলেন। সেখানে তাদের গ্রেপ্তার করেও ঐশী ক্ষমতা দেখে ছেড়ে দেয় চীনারা। হিমালয়ের বদ্রীনাথ সহ বহু তীর্থস্থানও লোকনাথবাবা পদব্রজেই পরিভ্রমণ করেন।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অন্তে পুনরায় শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গজীর আশ্রমে ফিরে এলে তিনি তাদের সাধারণ মানব সমাজে গিয়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। গুরু ত্রৈলঙ্গের নির্দেশে বাবা লোকনাথ রওনা দিলেন লোকসমাজের উদ্দেশে। পথে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দাবানলের মধ্যে শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে যোগবলে উদ্ধার করেন লোকনাথ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছুদিন থাকার পর বেণীমাধব চলে গেলেন কামাখ্যায় আর লোকনাথবাবা চলে এলেন তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশে। অসম ও ত্রিপুরাতেও লোকনাথবাবা কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। ত্রিপুরায় থাকাকালীন ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে আদালতের অনিবার্য শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেন লোকনাথ। মুক্ত ডেঙ্গু কর্মকার বাবার শ্রীচরণে সঁপে দেন নিজেকে। বাবাকে তিনি নিয়ে যান বারদী গ্রামে নিজের আলয়ে। ডেঙ্গুর গৃহে থাকাকালীন একদিন চারজন ব্রাহ্মণকে পৈতের গ্রন্থি মন্ত্র বলে খুলে দিয়ে বিস্মিত করে দেন লোকনাথ। এ ঘটনায় তাঁর সুনাম ছড়িয়ে যায় এলাকায়, বারদীর জমিদার নাগমহাশয় বাবাকে জমি দান করেন। সেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাবার দর্শনের জন্য প্রচুর জন সমাগম হতে থাকে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাওয়ালের রাজাও তাঁর দর্শনে আসেন। ভাওয়ালের রাজা লোকনাথবাবার ফোটোগ্রাফ তোলেন। অনেকেই বাবাকে এই সময় ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতে থাকেন।

অবশেষে ১৮৯০-এর ১৯ জ্যৈষ্ঠ যোগবলে বাবা দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর একশ বছর বাদে তার ব্যাপক পূজা প্রচলিত হবে সমাজে একথা লোকনাথজী জানিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয় না। সত্য সত্যই ১৯৯০ সালের পর থেকে বাবাকে নিয়ে গ্রন্থ লেখা, ফোটোগ্রাফ ও লকেটে বাবার ছবির ব্যাপক ব্যবহার, চলচ্চিত্র নির্মাণ, বাবার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় সমাজে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(লোকনাথবাবার ১২৩ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

পরম্পরা

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

সংকর্ষণ মাইতি

কথায় আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। বিশেষতঃ হিন্দুদের। পার্বণগুলি ঋতু অনুযায়ী। আবার পার্বণগুলির মধ্যে কয়েকটি 'যাত্রা'-যুক্ত অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। যাত্রা অর্থে গমন, নির্বাহ, যাপন। মিছিল (শোভাযাত্রা)। অভিনয় (লোকসংস্কৃতি)। বার, দফা (যেমন— এ যাত্রায় বেঁচে যাওয়া)। দেবতার উৎসব বিশেষ (যেমন— স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা)। দেবতার এই যে উৎসব স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান। এবং অবশ্যই শ্রীরাধিকাও যুক্ত। এই যে রথযাত্রার পূর্বে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, এক্ষেত্রেও রাধা-কৃষ্ণের নাম জড়িয়ে রয়েছে। পরে আলোচ্য।

ভারতে যে সব জায়গায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সেখানে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় (উভা অমাবস্যার পনেরো দিন আগে) জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্নানযাত্রাটিকে আবার 'মহাস্নানযাত্রা' বলা হয়েছে। যেমন দুর্গাপুজোর দিনগুলিকে মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী নামে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রেও মহাস্নানযাত্রা। মহাসমারোহে মহাস্নানযাত্রা। স্নানযাত্রার তাৎপর্য আছে বৈকী! ওড়িশার পুরীতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাসমারোহে হয়ে থাকে (অন্যান্য জায়গাতেও হয়)। জগন্নাথ-কথন নিয়ে এক পদকর্তা লিখেছেন—

"রহিব মাহেশে তোমার সকাশে
আমি যে জগৎপতি,
মাহেশেতে স্নান উড়িষ্যায় ভোজন
রবে চিরদিন খ্যাতি।"

মাহেশে ধ্রুবানন্দের প্রতি পুরীর জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ এটি। মাহেশে যে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এর পেছনে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। ধ্রুবানন্দের মনে সাধ ছিল পুরীতে গিয়ে নিজ হাতে জগন্নাথদেবকে রান্না করে খাওয়াবেন। কিন্তু পুরীতে রান্না করে খাওয়ানো তো দূরের কথা, পাণ্ডাদের হাতে শুধুই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছিল, যার জন্য স্থির করেছিলেন অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি গাছের তলায় অনাহারে থাকলেন। তিনদিন। এক রাতে জগন্নাথদেব স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন—

"আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি আমাকে একদিন রান্না করে খাইয়ে খুশি করতে চাও? আমি তোমার হাতে একদিন অন্নগ্রহণ করব না। যতদিন পারবে নিজহাতে রান্না করে খাওয়াবে। তবে এখানে না। তোমার কুটির-আশ্রমে আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করব। ফিরে যাও মাহেশে। গঙ্গানদীতে একটি নিমকাঠ ভেসে আসবে, সেটি তুলে পুরীর মতো নাহলেও নিজের মতো করে বিগ্রহ গড়বে। তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।"

ধ্রুবানন্দ আশ্বস্ত হয়ে মাহেশে ফিরে এলেন। স্থির করলেন মাহেশে গড়া হবে নবনীলাচল। পরের ঘটনা— গঙ্গায় নিমকাঠ ভেসে আসে। সেটি তুলে ঠাকুর তৈরি করলেন। প্রতিষ্ঠা হলো জগন্নাথদেবের। পাশে সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিও। পুরীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকেও নীলমাধব স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। (অন্যমতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদীতে নীলমাধব আবির্ভূত হয়েছিলেন)। বলেছিলেন— 'পুরীর সমুদ্র তীরে চক্রতীর্থে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত দারুব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ভেসে আসবে এই সুলক্ষণযুক্ত কাঠ। সেই কাঠ তুলে মন্দিরে ঠাকুর গড়তে হবে।' পুরীর জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি তৈরির পেছনে কাহিনীটি সকলের জানা। মাহেশের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দের ব্যাপারে তা হয়নি। পুরীর অনুকরণে মূর্তি তৈরি করিয়েছেন। ছোট ছোট মূর্তি। ছ'শো বছরেরও আগের ঘটনা। ধ্রুবানন্দ নিজহাতে রান্না করে ঠাকুরদের ভোগ নিবেদন করতেন। যেমন তিনি পেরেছেন। কথায় আছে— 'খিচুড়ি-অন্ন-পায়েস— তিন নিয়ে মাহেশ।' প্রথম প্রথম ধ্রুবানন্দ হয়তো খিচুড়ি পায়েস দিয়ে শুরু করেছিলেন। এরপর নানান ব্যঞ্জন, পরবর্তী সময়ে। যাইহোক, কথায় আছে— 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।' গঙ্গার পশ্চিমকূলে এই মাহেশ যেখানে স্বয়ং চৈতন্যদেব এবং রামকৃষ্ণদেব-সারদামণি এসেছেন। ১৫১০

সালে নীলাচল গমনকালে চৈতন্যদেব মাহেশে গিয়েছিলেন, যখন ধ্রুবানন্দ বুড়ো হয়েছেন। ধ্রুবানন্দের অনুরোধে ঠাকুরদের ভার বা দায়িত্ব নিতে হয় চৈতন্যদেবকে। তিনি কমলাকর পিপ্পলাইকে মাহেশের ঠাকুরদের পূজার্চনার দায়িত্ব নিতে বলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে কমলাকর পিপ্পলাই-এর সেবারে নীলাচলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে ১৫১৫ সালের আগেই কমলাকর দায়িত্ব নিয়েছিলেন মনে হয়। যখন ১৫১৫ সালে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যান, তখন কমলাকর ঠাকুরের পূজার্চনা করছেন। পদকর্তার লেখায় জানা যায় 'মাহেশেতে জগন্নাথদেবের স্নান, উড়িষ্যায় ভোজন'...। হতে পারে। তবে অদ্বৈতবাদীদের বিশ্বাস— শ্রীকৃষ্ণ চারধামে চাররূপে রয়েছেন। পুরীতে জগন্নাথ, দ্বারকায় দ্বারকানাথ, উত্তর ভারতে বদ্রিতে বদ্রিনাথ এবং রামেশ্বরে রামনাথ। শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং জগন্নাথ (নীলমাধব কৃষ্ণেরই আরেক রূপ)। জগন্নাথদেব বদ্রীনাথে স্নান করেন, দ্বারকায় বেশভূষা পরিধান করেন, পুরীতে অন্নগ্রহণ করেন এবং রামেশ্বরে শয়ন করেন। স্নানের কথা মাহেশে বদ্রীনাথে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তবে একথা অনস্বীকার্য, যেখানে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে স্নানযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অমন যে পুরী, যাকে শ্রীক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে, সেখানে তো সবকিছুই জগন্নাথ সংস্কৃতি। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ, জগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দির— যা শুধু ভারতে না সমগ্রবিশ্বে সুখ্যাতি রয়েছে। এখানে জগন্নাথদেবের মহাস্নান যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবং যে জল দিয়ে ঠাকুরদেব স্নান করানো হয় সেই জল তোলা হয় একটি কূয়ো থেকে। যে কূয়ো থেকে জল তোলা হয় তাকে 'সুনা কু-অ' বলে। অর্থাৎ স্বর্ণকূপ। জানা যায়, রাধারাণীর প্রেম নাকি এই 'সুনা-কু-অ'-তে জল হয়ে আছে। (নন্দ গাঁও-এর সাড়ে আট কিমি দূরে বারসানা গ্রামে রাধারাণীর বাসস্থান আবার শ্রীকৃষ্ণ থাকতেন বৃন্দাবনে। উভয়ের দুই জায়গায় যাতায়াত ছিল।)

রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। বিশেষ করে তাঁদের প্রেম নিয়ে। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে 'সুনা-কু-অ-তে-রাধারাণীর প্রেম জল হয়ে রয়েছে, সেই জলে আবার জগন্নাথদেবকে স্নান করানো হয়। ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকছে, তাই না? কাহিনী আছে।

একবার শ্রীকৃষ্ণের জ্বর হয়েছিল। জ্বরের কারণ নাকি তাঁর প্রেমিকা রাধারাণীকে ব্রজবাসীরা কলঙ্কিনী বলেছে। নন্দরাজা ও মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের (বাল্যকালের নাম গোপাল) গায়ে হাত দিয়ে দেখেন দারুণ জ্বর। বৈদ্য ডাকেন। কোনও ওষুধে কাজ হয়নি। এবার বৃদ্ধের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ মা ও বাবার সামনে এসে বিধান দিলেন, 'কোনও সতীলক্ষ্মী যদি শতছিদ্র-কলসিতে করে জল এনে শ্রীকৃষ্ণের গায়ে ঢালতে পারে তাহলে জ্বর ছেড়ে যাবে।...'

অসম্ভব ব্যাপার! রাধারাণীর ননদ কুটিলা সহ অনেকেই চেষ্টা করেও ব্যর্থ। তাঁদের উদ্দেশ্য তো সতীত্বের স্বীকৃতি পাওয়া। আর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হলো রাধারাণীর কলঙ্কিনী নাম ঘোচানো। রাধারাণীকে দিয়েই শতছিদ্র-কলসিতে জল আনিয়ে কলঙ্কিনী নাম ঘুচিয়ে সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়া। তাই হলো। রাধারাণী শতছিদ্র-কলসিতে করে যমুনার জল এনে গায়ে ঢেলে দিতেই শ্রীকৃষ্ণের গায়ের জ্বর ছেড়ে যায়। কলঙ্কিনীর অপবাদ ঘুচেছিল। কী করে এটা সম্ভব হলো? আসলে প্রেম-ভক্তির জোরেই সম্ভব হয়েছিল— শতছিদ্র-কলসিতে জল আনা। সেই প্রেম 'সুনা-কু-অ'-তে জল হয়ে আছে, যে জলে জগন্নাথদেবকে স্নান করানো হয়। প্রেম ও ভক্তি যে মূল কথা, এটা বোঝাতে এই কাহিনীর অবতারণা যা লোককথা বা লোক বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত।...

যাক, ওই 'সুনা-কু-অ'-র কাঁচা জলে স্নান করাতেই আবার জগন্নাথদেবের গায়ে জ্বর। জ্বর ছাড়ানোর জন্য পাঁচনের ব্যবস্থা। পাঁচন খাইয়ে দিলে জ্বর ছেড়ে যায়। নিমপাতা, আমলকি, হরিতকী, জায়ফল, কালমেঘ পাতা, আদা, মধু, সিদ্ধিপাতা, দারুচিনি, গোলমরিচ ও কর্পূর বেটে দুধ ও গঙ্গাজলে মিশিয়ে পাঁচন তৈরি হয়। এই পাঁচন আয়ুর্বেদিক ওষুধ। আগেকার দিনে অ্যালোপ্যাথ ওষুধের ব্যবহার ছিল না। অসুখ- বিসুখ হলে কবিরাজি বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহৃত হোত। এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বাংলা সাহিত্যে পাঁচনের উল্লেখ রয়েছে। এই পাঁচন এখনকার যুগে প্রচলিত না হলেও দেবতাদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। (বর্তমানে আয়ুর্বেদিক ওষুধকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে)— যাইহোক, কয়েকদিন পাঁচন খেয়েই জগন্নাথদেবের জ্বর ছেড়ে যায়। এটা প্রতীকী। সত্যিই তো, একসময় জ্বরের মহৌষধ ছিল এই পাঁচন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এখনও দেশের কোথাও না কোথাও এই পাঁচন ব্যবহৃত হচ্ছে।...

জ্বরের সময়কালীন মন্দির পনেরো দিন বন্ধ রাখা হয়। ঠাকুর দর্শন বন্ধ। এই সময়টাকে বলা হয় 'অনবসর' বা 'অবসরকাল'। আসলে, রথযাত্রার পূর্বে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠানটি হয় কয়েকটি কারণে। এক— পুরো এক বছর পরে স্নান। তার মানে মূর্তির গায়ে ধুলোময়লা জমে যায়। পরিষ্কার করতে এই স্নান-অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, কয়েকদিন পরে ঠাকুর রথে চড়বেন। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে ঠাকুরের অঙ্গরাগের ব্যবস্থা করা হয় এই সময়ে।

মাহেশেও গঙ্গা থেকে গঙ্গাজল আনা হয়। সেই জলে জগন্নাথদেবকে স্নান করানো হয়। এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। (অনেক জায়গায় সুগন্ধি দ্রব্য জলে মিশিয়ে স্নান করানো হয়।)

তথ্যসূত্র :

- মাহেশের রথযাত্রা— শৈলেন কুমার দত্ত/আপনজন/হলদিয়া/ উৎসব সংখ্যা ২০০৩।
- পুরীর জগন্নাথদেবের অমৃতকথা— সুমন গুপ্ত/বর্তমান/শারদ সংখ্যা ১৪১১।
- পুরী মাহেশ ও মহিষাদলের রথযাত্রা— সংকর্ষণ মাইতি/ বাকপ্রতিমা/মহিষাদল— জুন- ২০০৬।
- নবনীলাচল শ্রীপাট মাহেশের ইতিকথা--- দেবাঞ্জন দাস/বর্তমান- ২০।১২।২০০১।

গাছ লাগানোর গল্প

গাছের শত্রু ও মিত্র

গাছটা লাগিয়েছিল দুর্লভ সামন্ত। তার গম ভাঙানো দোকানের কাছেই একটা জঞ্জাল ফেলার জায়গা। পাড়ার লোকে সকালে বিকেলে নোংরা ফেলত। পুরসভার সাফাইকর্মীরা কখনও সাফ করত, কখনও ফেলে রাখত। দুর্লভের দোকানের সামনে বলে তাকেই পোহাতে হোত সব ঝক্কি ঝামেলা। পুজোটুজোর সময় বকশিস নিয়ে কাজ করত সাফাইকর্মীরা। সাফাইকর্মীরা যোগাযোগ রাখত দুর্লভের সঙ্গে। পাড়ার লোকজন পয়সা দিত না। ময়লা ফেলার সময় কারও উৎসাহে ঘাটতি নেই। কয়েকজন বলাবলি করছিলেন, 'নোংরা ফেলার জায়গাটা এখান থেকে সরালে ভালো হয়।' একজন বললেন, 'ওখানে গাছ লাগিয়ে ঘিরে দিলে ময়লা ফেলা বন্ধ হবে।' কি গাছ লাগানো হবে ঠিক হলো। বটগাছ। কারণ বটগাছ বড় হলে অনেক উপকারে আসবে। গাছের চারা এনে দিয়েছিল সাফাইকর্মী জয় হেলা। এদিকের নামকরা পার্কে যে বটগাছটা রয়েছে তার বয়স অনেক। ঠিক কত বছর কেউ হিসেব করেনি। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছের মতো প্রাচীন নয় ঠিকই, তবে গাছটাকে বহুকাল ধরে একইরকম দেখেছে দুর্লভ। গাছটা পোঁতার আগে ওখান থেকে জঞ্জাল ফেলার জায়গা সরিয়ে সাফ করা হয়েছিল।

গাছ লাগানোর পর চারদিকে বেড়া দেওয়া হলো। তারের জাল বাঁশের খুঁটি কিনে এনেছিলেন বিজন রায়। একসময় বিদেশি দূতাবাসে কাজ করতেন। বাড়িতে প্রচুর গাছ আছে। পাড়ার কাঠের মিস্ত্রি লোচন মহান্তি বিনা মজুরিতে কাজ করে দিয়েছিল। চারা গাছের শত্রু অনেক। সেসব শত্রুদের নাগাল থেকে গাছ রক্ষা জরুরি। দুর্লভ জেনে নিয়েছিল গাছের জন্যে কেমন মাটি কি কি সার দরকার। কয়েক বছরের মধ্যে গাছটা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। বিজন রায় বললেন, 'আর ভয় নেই। গাছটা এবার নিজের শিকড়ের উপর ভরসা রেখে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক বড় হয়েছে।'

গাছের মিত্র অনেক হলেও শত্রু কম নয়। সামনের বাড়ির শৈবাল বিশ্বাস লোকটা সুবিধের নয়। গাছ লাগানোর সময় থেকে সে ক্রমাগত বলছিল, 'গাছ লাগানোর কাজটা ঠিক হয়নি। উল্টোপাল্টা লোক এসে বসবে। গাছে পাখি বসে নোংরা করবে। চোরদের আশপাশের বাড়িতে ঢোকার সুবিধে হবে।' সে এসব কথা বলতে লাগল। গাছ লাগালে কি কি উপকার মানতে চাইল না। তাকে মদত দিতে চাইল সুমন ভৌমিক নামে একটা ভয়ঙ্কর পাজি লোক। গাছটা রাতে গাড়ির ধাক্কায় কাত হবে। তারপর রাতারাতি কেটে সাফ করবে ঠিক করেছিল। কাজটা করলেও তা ধরা পড়ে যায়। সামনের বাড়ির নিচে শুয়ে থাকে লক্ষ্মণ দাস। সে সব জানাল। গাছ সাফ হলো। পরেরদিন আবার বেদী তৈরি করে লাগানো হলো গাছ। এবারও চারা এনে দিল জয় হেলা। পাড়ার লোকজন জড়ো হয়ে বলল শৈবাল বিশ্বাসকে, 'তোমাকে ক্ষমা করছি আমরা এবারের মতো। তবে তোমার মদতদাতা সুমন ভৌমিক এ পাড়ায় যেন না ঢোকে।' শৈবাল এই সিদ্ধান্ত না মানলে তাকে পাড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা পাকা করত ছেলের দল।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

চৌম্বক সাবান এবার আসছে

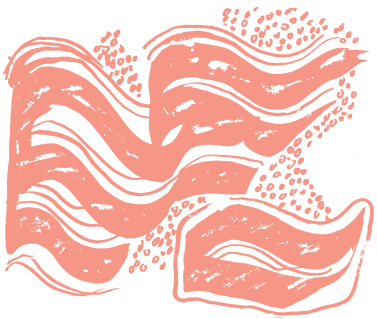

বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের শরীরের মধ্যে কমবেশি চৌম্বক-শক্তি আছে। তা থাক। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এমন একটা চৌম্বক সাবান আবিষ্কার করতে যার কাজ হবে শরীরের ময়লা টেনে নেওয়া। কোনও ময়লা লুকিয়ে থাকবে না শরীরের চামড়ায়। সব টেনে নেবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আশ্চর্য সাবান দূর করে দেবে বর্জ্য জলের ময়লাও। সাবানের টুকরো ফেলে দিলে নোংরা জল সাফ হয়ে যাবে। অনেক রকম সুবিধে পাওয়া যাবে।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই চৌম্বক সাবান। লোহার পরমাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সাবানের অণুর মধ্যে। বর্জ্য বস্তুতে সাবান দিলে লোহার পরমাণুগুলো পরস্পর জুড়ে গিয়ে খুব ছোটো ছোটো কণার সৃষ্টি করবে। সাবান মেশানো বর্জ্যের উপরে চুম্বক ধরলে তার টানে বেরিয়ে আসবে যাবতীয় তেল ময়লা।

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জুলিয়ান ইয়াসটো জানিয়েছেন, 'সবই রয়েছে পরীক্ষামূলক স্তরে। তবে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দেখতে হবে, বড় মাপে এবং বাণিজ্যিক স্তরে এই সাবান ব্যবহার করা যায় কিনা।'

বার্তাবহ

রিয়াদের পরিবেশ দিবস

পরিবেশ রক্ষায় ছোটোদের উদ্যোগ

পরিবেশ দিবসের দু-সপ্তাহ আগে রিয়ারা জড়ো হয়েছিল বেণুজ্যেঠুর বাড়িতে। ওরা ঠিক করল ওইদিন সকালে পার্কে যারা বেড়াতে যাবে তাদের পরিবেশ দিবসের ব্যাচ পরিয়ে দেবে। শপথ নেবে পরিবেশ রক্ষার। পাড়ার মধ্যে কিছু কাজ হবে। আর প্রত্যেকে অংশ নেবে স্কুলে পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে। পরিবেশ নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী হবে। তাতে থাকবে নানারকম তথ্য আর ছবি। সেইসঙ্গে অল্প কথায় লেখা পরিবেশ নিয়ে। ভালো কাজে টাকার অভাব হয় না। বড়োরা খুব উৎসাহ পান ছোটোদের কাজে। সবাই মিলে কোমর বেঁধে লাগতে হবে। রিয়ার দাদু বলেন, 'নাতি-নাতনিদের সব কাজে আমার সমর্থন আছে।' শুধু সমর্থন নয়, সহযোগিতাও। কদিন ধরে প্রস্তুতি চলল রিয়াদের পরিবেশ দিবস পালনের। আঁকা লেখা দিয়ে সাজানোর কাজ হলো। ঠিক হয়েছে, গাছ লাগানো হবে কয়েক জায়গায়। ফল গাছ, না ফুল গাছ লাগানো হবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলল। পাড়ার কোনও দেয়ালে কোনও রাজনৈতিক দল বা অন্য কেউ কিছু লিখতে সাঁটতে পারবে না— এই সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে। রাস্তায় কেউ কিছু ফেললে সঙ্গে সঙ্গে ধরা হবে। কাউকে যেখানে সেখানে থুতু পানের পিক ফেলতে দেখলে শাস্তি হবে কঠোর। পাড়ার মধ্যে কেউ মাতলামি করতে পারবে না। কোনও বাড়িতে বা দোকানে শিশুশ্রমিক থাকবে না। পাড়ার মধ্যে সহযোগিতা থাকবে পরস্পরের মধ্যে। ঝগড়াঝাঁটি এড়াতে হবে। একে অন্যের বিপদে-আপদে ছুটে আসবে। এসব ভেবে নিয়েছিল রিয়ারা। ৫ জুন পরিবেশ দিবস চমৎকার চেহারা নিল। সকলের সহযোগিতায় দিনটি অন্যরকম হয়ে উঠল। ওরা ঠিক করল পরিবেশ দিবস নিয়ে একটা ছোট বই বের করবে লেখা আর আঁকা সাজিয়ে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'সকল অহংকার হে আমার/ডুবাও চোখে জলে'। এই গান কার লেখা? কবে লেখা? কোন্ বইতে আছে?

২. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথমে নাম কি ছিল? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কোন্ সালে?

৩. 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ'। এ গান কোন্ উৎসবে কোথায় গাওয়া হয়?

৪. বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে 'অরন্ধন' প্রস্তাব কে দিয়েছিলেন? তাঁর জন্ম কবে?

৫. 'তিনকন্যা' ছবির পরিচালক কে? কাহিনীকার কে? গল্প তিনটির নাম?

উত্তর : ১. রবীন্দ্রনাথ। ১৩১৩। গীতাঞ্জলি। ২. কামদারঞ্জন। ১৮৬৩। ১৯১৫। ৩. বৃক্ষরোপণ উৎসব। শান্তিনিকেতন। ৪. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ২০ অগাস্ট ১৮৬৪। ৫. সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথ। পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, মণিহারা।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

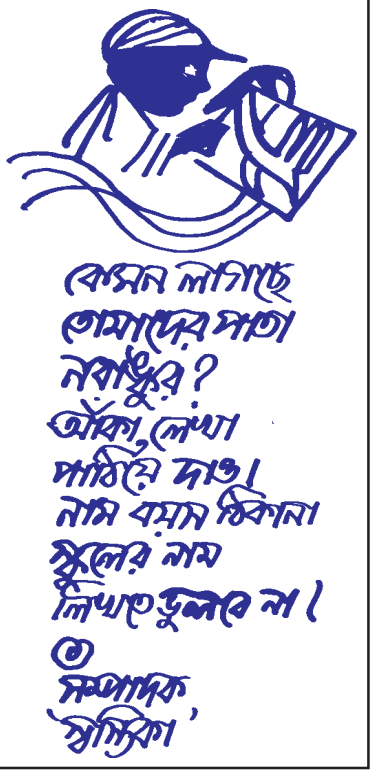

পরিবেশ দিবসে মন্ত্রিমশাইকে এক জায়গায় বলতে হবে। তিনি সচিব জয়ন্ত রায়কে ডেকে বললেন, 'একটা জম্পেশ বক্তৃতা লিখে দাও। পনেরো মিনিট বলবো।'

জয়ন্ত ভালো লেখে। নেতাবাবুর সব বক্তৃতাই তার লেখা। পরে সেসব ঢুকে যাবে নেতার রচনাবলিতে। বরাত খারাপ হলে ক্ষমতা চলে যাবে। সে যাকগে। জয়ন্ত বক্তৃতা লিখে টাইপ করিয়ে নিল বড়ো বড়ো অক্ষরে। নেতাবাবু ছোটো হরফ পড়তে পারেন না।

বেশ সাজগোজ করে নেতা গেলেন সভায়। বক্তৃতার কপি আনতে ভোলেননি। বাড়িতে ভালোভালো খাবার খেতে অনেকটা সময় গেছে। খাওয়ার দরুন গাড়িতে ঘুম হয়েছে মন্দ নয়। বক্তৃতাটা দেখা হয়নি। জয়ন্তর উপর ভরসা আছে তাঁর। যা লিখবে ভালোই লিখবে।

নেতাবাবুর ভাষণ দেওয়ার সময় এলো। তিনি গটগট করে হেঁটে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। কাগজ বের করে বেশ আবেগ যোগ করে পড়তে লাগলেন। বক্তৃতা শেষ হয় না। দুবার জল খেলেন নেতাবাবু। সভার মধ্যে উশখুশ।

সভাশেষে নেতাবাবু ডাকলেন জয়ন্তকে। বললেন, 'তোমাকে পনেরো মিনিটের বক্তৃতা লিখে দিতে বলেছিলুম। লিখলে ৪৫ মিনিটের!'

জয়ন্ত কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, ভুল হয়ে গেছে একটা। বক্তৃতার তিনটে কপিই আপনার কাছে চলে গিয়েছিল।'

রামগরুড় সংকলিত

মহিলাদের একাকিত্ব ও আইন

অরুণা মুখোপাধ্যায়

উপরের শিরোনাম প্রসঙ্গে একটা বিপরীত অর্থ মনে আসে, সেটি হলো মহিলারা কোনওদিনই একাকী নয়। তারা অপরের উপর নির্ভরশীল— শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।

তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে— সেই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে আইন। বর্তমানের পার্থিব জগতে ও আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখবো মহিলারা কেউই একাকিত্বের ভার বহন করেন না। অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও বিধবা মহিলারা আজ নিঃসঙ্গতার পৃথিবী থেকে বিতাড়িত। অবিবাহিত মহিলারা নিজেদের প্রিয়জন মা বাবাকে হারালেও তাঁরা আজ নারী প্রগতি ও সভ্যতার যুগে নানাধরনের কারিগরী শিক্ষার প্রভাবে জীবনের বেশির ভাগ সময়েই কর্মজগতে ব্যাপৃত। এখন প্রশ্ন হলো কর্মের বাইরে নিজের গৃহে থাকাকালীন, তাঁরা নিজেদের নিঃসঙ্গ ভাবতে পারেন কিনা। এর উত্তর কিন্তু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। কারণ শিক্ষার বিশেষ ডিগ্রি আছে আধ্যাত্মিক জগতে। অর্থাৎ পার্থিব জগতে প্রিয়জনের দেহ হলো বিন্দুর ন্যায়, সাময়িক— যে কোনও সময় এই বিন্দু বিরাট বিশ্বের অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মুছে গিয়ে বিরাটত্বে পৌঁছে যেতে পারে যে কোনও সময়ে তাঁর প্রারব্ধ কর্মযোগের ফলভোগের শেষে। এছাড়া মর্ত্যলোকেও সে একা নয়— কারণ আইনের অধীনে ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে অবিবাহিতা মেয়েরাও ছেলেদের মতোই দত্তক গ্রহণ করে একাকিত্ব কাটাতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দর উক্তিতে আছে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা নিজেরাই কাটাতে যাতে পারে সেই শিক্ষাই তাদের লওয়া উচিত। এই বিষয়ে পরিণত বয়সধারী অথচ

অপরিণত কুমারী মেয়েদের যৌবনেই নৈতিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্নতার শিক্ষা মায়েদেরই দেওয়া উচিত, যাতে মেয়েদের একাকিত্ব জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে কোনও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ না করতে পারে। ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের রেজিস্ট্রেশন করার বিশেষ বিধি নানা অছিলায় অমান্য করে অসৎ উদ্দেশ্যে অবিবাহিতা মেয়েদের সর্বনাশ করে বসেন বহু অপদার্থ, স্বার্থলোভী পুরুষ।

এই বিষয়ে মহিলাদের শিক্ষার অভাব থাকলে প্রকৃত স্বামীর অভাবে তাঁদের নিঃসঙ্গতাই জীবনের শেষ দিনে ঘটে। সুতরাং জগতে প্রকৃত প্রেম, দরদীমন, আন্তরিকতা খুঁজে না পেলেই মনে হয় সব ধনের মহিলারাই একাকী। কিন্তু শ্রীশ্রী

অঙ্গনা

মায়ের একটা উক্তি এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হলো— "যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনো আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না..."

সুতরাং বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে আমরা মহিলারা কোনও সময়ই একাকী মনে করবো না ও আমাদের মনের দুর্বলতা থাকলেও বাইরের জগতে একান্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রিয়জন ব্যতীত কারোর কাছে প্রকাশ করবো না। যেহেতু তাঁরা নিজেরা মনে অশান্ত ও হিংসাপরায়ণ থাকায় বহু সময় এইসব দুঃখী মহিলাদের কাছে ব্যথিত মন নিয়ে না এসে তাঁদের জীবনে আরও হতাশা এনে দেন ও মন ভেঙে দিয়ে তাঁদের লোকদেখানো দরদ দিয়ে সর্বনাশ করেন যার ফলে বহু সময় এইসব হতাশাগ্রস্ত মহিলা মনঃরোগের শিকার হন। এঁদের মধ্যে স্বামীহারা অথবা অযৌক্তিক কারণে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মহিলারাও আছেন যাঁরা আইনের আশ্রিত না হয়েও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করে একাকী নন।

আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ— এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সারদামা, গৌরীমা, আনন্দময়ীমা ও আরও বহু ধর্মপ্রাণা মাতাজী— যাঁরা জীবনে কোনওদিনই একাকী হয়ে থাকেননি ও ভাবেননি। তাঁরা মনে করতেন সর্ব অবস্থায় একটা সর্বোত্তম শক্তি চালিত করছেন ও প্রহরাধীনে আছেন। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জানাই যে— ব্যক্তিগত জীবনে আমি মাতৃপিতৃহীন হয়েও সম্প্রতি আমার পুত্রবৎ একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরকে পার্থিব জীবনে হারিয়েছি ও অবিবাহিতা মহিলারূপে আমার বাস্তব ও আধ্যাত্মিক চিন্তাই সেজন্য আলোকপাত করলাম। উদ্দেশ্য একটাই মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখ মোচন।

ইমামদের হামাম খরচ জোগাবে তামাম হিন্দু সমাজ

শিবাজী গুপ্ত

গান্ধীর অতৃপ্ত ও অশুদ্ধ প্রেতাত্মা কি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে ভর করেছে? সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায় হিজাব পরিহিতা এই মহিলা আল্লা আল্লা বলে মুসলমানদের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ দান-খয়রাতের ঘোষণা করছেন। তা করুন। কেউ যদি নিজের টাকায় বা বাবার টাকায় দানসত্র খুলে বসেন তাতে কারও কিছু বলার থাকে না। কিন্তু টাকাটা যখন সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হবে, তখন সে খরচের পাইপয়সা হিসাব চাওয়ার অধিকার সকলের আছে; সে খরচের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার রাজ্যবাসী মাত্রেরই রয়েছে। এককালে 'হঠাৎ' বড়লোকেরা বিড়ালের বিয়েতে কিংবা পায়রার লড়াইতে নাকি লাখ লাখ টাকা খরচ করত এবং অনতিবিলম্বে ফতুর হয়ে অবিমৃষ্যকারিতার খেসারত গুণত।

কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত ধনসম্পদের অপব্যবহারের পরিণতি। রাষ্ট্রের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনও অধিকার তো কোনও মন্ত্রিমণ্ডলকে কোনও সংবিধানেই দেয়নি। সমাজ যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তখন সরকারি অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঙ্গলজনক কাজে সমহারে ব্যয়িত হওয়াই বিধেয়। মন্ত্রী মহোদয়া যদি এক সম্প্রদায়ের কল্পতরু হয়ে বসেন ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি থর মরুভূমির মতো তরুলতাহীন নির্দয় নিষ্করুণ আচরণ করেন, তাহলে 'আইনের চোখে সবাই সমান' বুকনির অসারতা বা দ্বিচারিতাই প্রকাশ পায়। এক শ্রেণীর মেয়েদের চিবুক স্পর্শ করে এবং ছেলেদের নুর নেড়ে দিয়ে কোরাণের সুরা আওড়ালে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে successful delivery হবে সে নাড়িজ্ঞান তাঁর মতো টনটনে আর কোনও নেতানেত্রীর নেই।

তাই শেখের বাচ্চাদের নাড়ি কাটার ও বুড়োদের দাড়ি-ছাঁটার খরচ জোগাতে তিনি মুক্তহস্ত।

তা তিনি মুক্তহস্ত বা মুক্তকচ্ছ যা-ই হোন, টাকাটা যখন সরকারি কোষাগার থেকে যাচ্ছে, তখন তার সপক্ষে বা বিপক্ষে বলার হক জনসাধারণের অবশ্যই রয়েছে। যাদের আরাম আয়েশের জন্য তিনি সরকারি সিন্দুকের তালা ভেঙে ডালা খুলে রেখেছেন, তা শুধু মোল্লাপাড়ার দিকে যাবে কেন? তাদের কি টাকাপয়সার অভাব? যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ওয়াকফ্ সম্পত্তির মালিকানা ওয়াকফ্ বোর্ডের হাতে রয়েছে তার থেকেই তো মুসলমানদের ধর্মকর্ম ও শিক্ষার খরচ মেটাতে পারা যায়। তার জন্য সরকারি কোষাগার উজাড় করতে হবে কেন? ইমামদের মাইনে, মসজিদ নির্মাণ, কবর সংরক্ষণ ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় বৃত্তি, দান ধর্ম কাজে ব্যয় করার জন্যই ওয়াকফ্ বা খোদাতাল্লার নামে বিষয় সম্পত্তি দান করা হয়।

কিন্তু তা হলে তো আর পরের ধনে পোদ্দারি করা হলো না। ইমামদের ভেট দিলেই তো প্রতিদানে তা ভোট হয়ে বাক্স ভর্তি করবে। ইমামরা দিলখুশ হয়ে দাতাকে দোয়া করবে, খোদার কাছে আরজ জানাবে, মোজাজাত করবে। মারহাব্বা দিদি! আপনি নীলপাড় সাদা খোল ছেড়ে শাড়ী পরে বামনী সাজার পরিবর্তে সর্বাঙ্গ কালো বোরখায় ঢেকে শেখ্‌নী সাজুন, বঙ্গবাসী দেখে নয়ন সার্থক করুক। তা না হলে কিসের পরিবর্তন!

প্রবহমান নদীস্রোত মানসিক শক্তি যোগান দেয়

অতিথি কলম

ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

শুধু বাংলাই নয়, গোটা ভারতবর্ষকে নদীমাতৃক দেশ বললে ভুল বলা হবে না। নদী মানুষকে পানীয় জল প্রদান করে, নদীর মাছ ধরে সমাজের একটা বিরাট অংশ জীবিকা নির্বাহ করে। এদেশে গঙ্গার উভয় পাড়ে গড়ে উঠেছে শহর, জনপদ, তীর্থ। নদীর জলই প্রাচীনকাল থেকে পানীয় জলের প্রধান উৎস। আধুনিক বিজ্ঞান সেই অবিরাম স্রোতধারাকে অবরুদ্ধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে নদীকেও বাণিজ্যিকীকরণের পথে নিয়ে চলেছে। এ যুগের কবি বলেছেন—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।

অর্থাৎ নদী তার প্রবহমানতা হারিয়ে ফেললে বদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। প্রবাদবাক্য আছে— বহতা নদী, রমতা যোগী। ভারতের বেশির ভাগ রাজ্য সরকারই নদীর স্রোতকে অবরুদ্ধ করে নালা দিয়ে প্রবাহিত করে টারবাইন বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জমিতে সেচের জন্য জলকে ব্যবহারে বিশেষ উদ্যোগী। তবে নদীকে কেন্দ্র করে তীর্থক্ষেত্র, পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে ওঠেছে--- যাকে সাংস্কৃতিক দিক বলা যায়।

কুম্ভ উপলক্ষে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুণ্যার্জন করতে বহু দূর দূর থেকে, দেশ-বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীরা প্রয়াগে একত্রিত হন। স্বচ্ছ, নির্মল জলে স্নান করতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু টিহরীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে জলের সেই স্বচ্ছতা নেই। বাঁধ তৈরির আগের মতো অবগাহনের আনন্দ আজ আর নেই। ওড়িশার মহানদীর উপর হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বাঁধের নীচে দশ কিলোমিটার দূরে এক শিবমন্দির আছে। মন্দিরের পূজারীর বক্তব্য— মহানদীতে 'স্নান ও পূজা' প্রথাই সমধিক প্রচলিত ছিল। এখন ওই প্রথা আর নেই। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম-এ কৃষ্ণা নদীর জল নিয়েই শিবের অভিষেক করতেন ভক্তরা। শ্রীশৈলম্-এ বাঁধ তৈরির পর থেকে সেই প্রথাও লুপ্তপ্রায়। নর্মদা পরিক্রমার পর ভক্তদের নদীকে পূজা করতেন ভক্তরা। নর্মদা-সরোবর ঝিল পরিক্রমার পর সেই সন্তোষ আজ আর নেই। খৃস্টানরাও নদীকে পবিত্র বলে মনে করে। ইজরায়েলের জর্ডন নদীর জল স্পর্শ করে খৃস্টানরা নিজেদের ধন্য মনে করেন।

মক্কার নিকটবর্তী জমজম স্রোতের জল মুসলমানদের কাছে বেশ শ্রদ্ধার। প্রবহমান

"মনকে জাগ্রত করার কঠিন কাজ নদীর স্রোতধারার পবিত্র জলরাশির মাধ্যমে হতে পারে। কোটি কোটি মানুষ সারাজীবনের সঞ্চয় কুম্ভস্নানে ব্যয় করে দেয়। দেবপ্রয়াগ, ঋষিকেশ এবং হরিদ্বারের প্রবহমান গঙ্গা নদীতে স্নান করতে আসা ৭৭ শতাংশ মানুষই জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছেন, নদীতে স্নান করে মানসিক শান্তি পেয়েছেন। স্নানের কারণে মন জাগ্রত হয় আর বুদ্ধি ও মনের সামঞ্জস্য গড়ে উঠে। ২৬ শতাংশ তীর্থযাত্রীরা জানিয়েছেন, তাঁদের শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে।"

জলধারা এবং নদীর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে মনে হয়, নতুন বাঁধ তৈরি করা উচিত নয়। আবার, মানুষের জীবনস্তর উন্নত করার জন্য বাঁধ বানানোরও যৌক্তিকতা আছে। দু'পক্ষই বলছে তারা লোককল্যাণের জন্য কাজ করছে। দু'পক্ষেরই জনকল্যাণের পার্থক্যটা বুঝতে হবে।

মনোবিজ্ঞান অনুসারে মানুষের চেতনার দুটো মূল স্তর আছে— চেতন ও অচেতন। সাধারণ বুদ্ধিতে চেতন-কে বুদ্ধি আর অচেতনকে মন বলা হয়। সুখী ব্যক্তির বুদ্ধি ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। মন যদি গান শুনতে চায় আর বুদ্ধি গানের অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়— তখন ব্যক্তি সুখ অনুভব করে। আর যদি ওই একই ব্যক্তি বন্ধুদের চক্করে পড়ে সিনেমা দেখতে চলে যায় তাহলে সিনেমা দেখেও 'সুখ' অনুভব হয় না। সুখের সোজা ফর্মুলা হলো— বুদ্ধিকে মনের অনুরূপ দিশা দিতে হবে। কিন্তু মনকে বোঝা খুবই কঠিন কাজ। পরিবার, পেশা, টেলিফোন, টেলিভিশন প্রকৃতির গোলমালে মনের আওয়াজটাই চাপা পড়ে যায়।

মন অসুস্থ এবং দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধি ও মনের এই অমিলই যাবতীয় রোগব্যধি এবং সাংসারিক দুঃখকষ্টের মূল। কারও হয়ত ড্রাইভার হওয়ার ইচ্ছা আর তাকে যদি মুদিখানায় বসানো হয় তাহলে ক্ষতি অনিবার্য। কারণ দোকানে বসে মনকে দাবিয়ে রাখতে হয়। তার মানসিক চেতনাশক্তির অর্ধেকটাই কাজে লাগে। খরিদ্দারদের সে তখন বুঝে উঠতে পারে না।

মনকে জাগ্রত করার কঠিন কাজ নদীর স্রোতধারার পবিত্র জলরাশির মাধ্যমে হতে পারে। কোটি কোটি মানুষ সারাজীবনের সঞ্চয় কুম্ভস্নানে ব্যয় করে দেয়। দেবপ্রয়াগ, ঋষিকেশ এবং হরিদ্বারের প্রবহমান গঙ্গা নদীতে স্নান করতে আসা ৭৭ শতাংশ মানুষই জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছেন, নদীতে স্নান করে মানসিক শান্তি পেয়েছেন। স্নানের কারণে মন জাগ্রত হয় আর বুদ্ধি ও মনের সামঞ্জস্য গড়ে উঠে। ২৬ শতাংশ তীর্থযাত্রীরা জানিয়েছেন, তাঁদের শরীর সুস্থ হয়েছে।

মনের চেতনশক্তি জাগ্রত হলে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক ঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে। ১৪ শতাংশ যাত্রী বলেছেন তাদের ব্যবসায় এবং ১২ শতাংশ বলেছেন তাদের চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। জাপানের বৈজ্ঞানিক মসারু ইমোটা দেখিয়েছেন, প্রবহমান নদীর জলে ছয়কোণীয় স্রোতধারা তৈরি করে। সম্ভবত এই আণবিক তরঙ্গের ফলে নদীর শক্তি সঞ্চিত হয়। বাঁধ দিলে এটা হতে পারে না বলে শ্রী ইমোটা জানিয়েছেন। জলবিদ্যুতের টারবাইন-পাখায় ধাক্কার ফলে জলের ষঠকোণীয় নষ্ট হয়। উত্তরকাশীর একটি সংস্থা টিহরী বাঁধের উপরের এবং নীচের জলের নমুনা সুইজারল্যান্ডের পরীক্ষা করিয়েছে। সেখানে দেখা গেছে— টিহরীর উপরের জলে ওই ছয়কোণীয় তরঙ্গ দেখা গিয়েছে কিন্তু নীচের জলে তা নেই। শ্রী ইমোটা মক্কার জমজমের জলেরও নমুনা সমীক্ষা করিয়ে উপরোক্ত ষট্‌কোণীয় স্রোতবৃত্তের সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন। এছাড়া মুক্ত জলধারায় অন্যান্য গুণও রয়েছে। জল পাথরে ধাক্কা দেওয়ার ফলে জলের মধ্যে তামা, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর ধাতুর সংমিশ্রণ ঘটে। বহমান জলধারায় লাভদায়ক ক্যালিফস জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার জন্ম হয়। বাধাহীন স্রোতে বিভিন্ন রকমের মাছ জন্মে, মাছ জলকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

বিবিধ পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে পৃথিবী জুড়ে বাঁধের কারণে নানা প্রজাতির মাছ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জল আটকে বাঁধ তৈরি করলে জলের গুণগত মান ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পায়।

অতএব মৌলিক প্রশ্ন হলো— মানসিক শক্তি-সামর্থ্য থেকেও কি বেশি জনকল্যাণ হবে বিদ্যুৎ থেকে? বিদ্যুতের আরও বিকল্প আছে— কয়লা এবং সৌরশক্তি। সেচ-এর ফসলেরও বিকল্প আছে— গমের বদলে যব এবং ছোলা চাষ। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক শক্তি-সামর্থ্যের আর কোনও সহজ ব্যয়হীন বিকল্প নেই। সেজন্য আমার অভিমত হলো— নদীর উপর বাঁধের কাজ বন্ধ করা, টিহরির মতো বাঁধ সরিয়ে ফেলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এসব কথা না বোঝার ফলে ভারতবাসী বাঁধের পিছনে দৌড়ে চলেছে। ইংরেজ শাসকরা অনেক ভারতীয়দের ভুল বুঝিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপরে গুলি চালিয়েছিল। বর্তমানে সরকার এবং জলবিদ্যুৎ কোম্পানীগুলো ভারতবাসীদের দিক্‌ভ্রমিত করে নদীগুলোকে ধ্বংস করছে। সেজন্য "জনগণ না বুঝেই নদীবাঁধকে সমর্থন করছে এমনটাই ধরে নিতে হবে।"

কংগ্রেস এবং বিজেপি— দুটি দলই দেশবাসীদের প্রতি উদাসীন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য দোহন করার পক্ষে।

স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের মতো মনীষীরা বলে গেছেন যে, পৃথিবীতে ভারতের ভূমিকা হবে 'আধ্যাত্মিক'। এই ভূমিকা আমরা নদীর প্রবহমান ধারা থেকে অনায়াস প্রাপ্ত মানসিক শক্তির উপলব্ধতাকে কমিয়ে দিয়ে পালন করতে পারব না।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ
সৌজন্যে : সন্মার্গ)

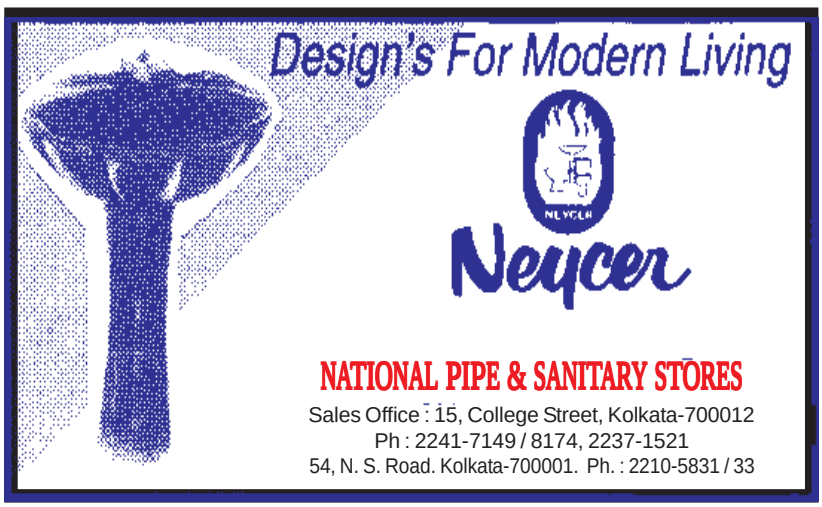

অসমসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মাওবাদী গতিবিধি বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার চাপে পড়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ রাজ্যে জাতীয় সন্ত্রাস মোকাবিলা কেন্দ্র বা এন সি টি সি স্থাপনের বিষয়ে সম্মতি জানালেন। সম্প্রতি রাজ্যের তিনসুকিয়া জেলার সাদিয়াতে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে চারজন কট্টর মাওবাদী জঙ্গি মারা পড়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যে মাওবাদী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি মারাত্মক বলে টের পেয়েছেন গগৈ। তিনি সম্প্রতি জানিয়েছেন---- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যৌথভাবে সন্ত্রাস দমনের ব্যবস্থা না হলে মাওদের ঠেলা সামলানো যাবে না।

শ্রীগগৈ আরও বলেছেন, ''কেন্দ্র আমাদের কথা বিশ্বাসই করত না। তবে এখন তারা জেনেছেন যে, অসমও মাও- সন্ত্রাসে জর্জরিত। আসল মাওবাদীরা-উত্তর- পূর্বাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে—তাতে সবক'টি রাজ্যের

সহযোগিতা না পেলে মাওবাদীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।"

মাওবাদীরা আপার অসমে মজবুত ভিত গড়ছে। উলফা জঙ্গিদের একটা গোষ্ঠী তাদেরকে সবরকম সহযোগিতা করছে। উলফা'র কম্যান্ডার ইন চিফ পরেশ বরুয়ার খবর গত ১০ মে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে উলফা-মাও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টা প্রকাশ্যে এসে গেছে। নাগাল্যান্ডের উগ্রপন্থী গোষ্ঠী এন এস সি এন (আই-এম) যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে অসমের বাইরে কোথাও মাওবাদীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে তরুণ গগৈ মাওবাদী কার্যকলাপ ঠেকাতে অসম ও সন্নিহিত রাজ্যগুলোর বেশ কিছু এলাকাকে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ ঘোষণা করে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে মাওবাদের সম্প্রসারণ ঠেকাতে কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। এখন মাওবাদীরা অসম লাগোয়া রাজ্যেও ঘাঁটি গাড়ছে। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এন সি টি সি বিশেষ উপযোগী হবে।

প্রায় ৩ লক্ষ নাগরিকত্ব মামলা ঝুলে রয়েছে অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমে সব মিলিয়ে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে (বিশেষ আদালত) ২,৭২,৫৯৩টি মামলা বকেয়া পড়ে রয়েছে। সরকারি সূত্রেই এই খবর পাওয়া গেছে। খাতায় কলমে যদিও ট্রাইব্যুনাল আদালতের সংখ্যা ৩৬ কিন্তু অনেক ট্রাইব্যুনালেই পুরো সময়ের বিচারক নেই। ফলে মামলা ঝুলে আছে। অনেক মামলা আবার 'ডি'-ভোটার বিষয়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভোটারলিস্টে নামের পাশে 'ডি' লেখার অর্থ হলো তাঁর নাগরিকত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে। এরকম 'ডি' চিহ্নিত ভোটারদের ভোট দেওয়া নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নিষিদ্ধ হলেও রাজনৈতিক দলগুলির বদান্যতায় তাঁরা প্রায় সকলেই ভোটদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। আবার মামলা ঝুলে থাকার কারণে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়াও যায়নি।

বিচারপতি এস এন সাইকিয়া তিনটি ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বে— শিলচর প্রথম, শিলচর দ্বিতীয় এবং হাইলাকান্দি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ 'ডি'-ভোটার ইস্যুতে প্রায়শই নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেন অথচ আইনমাফিক সমস্যা সমাধানে রাজ্য যে পুরো সময়ের বিচারপতি নিয়োগ করছে না— সেটা চেপে যান। কয়েক বছর আগে গগৈ একবার বিচারপতিদের সঙ্গে ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা মামলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি আর এগোননি। যদিও পর পর তিনবার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তরুণ গগৈ।

মঙ্গলনিধি

গত ২৭ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার সহ-কার্যবাহ রামসাগর নিবাসী তাপস রায়ের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর মাতৃদেবী শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায় মহকুমা সঙ্ঘচালক অধ্যাপক মানিকলাল চক্রবর্তীর হাতে ২০০১ টাকা 'মঙ্গলনিধি' সমর্পণ করেন।

***

গত ৩ মে বাঁকুড়া জেলার লক্ষ্যাড়া শাখার স্বয়ংসেবক তথা গঙ্গাজলঘাটী মহকুমা সেবাপ্রমুখ বরুণ লায়েকের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর মাতা শ্রীমতী মিনতি দেবী সেবা কাজের জন্য ৩০০০ টাকা মঙ্গলনিধি জেলা সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ আশীষ কুমার মণ্ডলের হাতে সমর্পণ করেন।

***

গত ৪ মে বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি নিবাসী ও খাতড়া মহকুমা সহ-কার্যবাহ সঞ্জয় দাসের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতৃদেব নবগোপালবাবু ২০০১ টাকা 'মঙ্গলনিধি' সেবা বিভাগের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগের হাতে সমর্পণ করেন।

মালদার সীমান্তে বাংলাদেশী সিমকার্ডের ব্যাপক চোরাকারবার চলছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী সিমকার্ডের ব্যাপক প্রচলন ও কারবার চলেছে। অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে এই সিমকার্ডের ব্যবহার হচ্ছে। চোরাকারবার, নারীপাচার , গো-পাচার সহ অনুপ্রবেশের সময় দুষ্কৃতীরা এইসব বাংলাদেশী সিমকার্ড ব্যবহার করছে। সস্তায় পরিচয়পত্র ছাড়াই সহজেই এই সিমকার্ডগুলি দুষ্কৃতীদের হাতে চলে আসায় জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ নড়েচড়ে বসেছে।

স্থানীয় সূত্র এবং গোয়েন্দা বিভাগ মারফৎ জানা গেছে মালদা জেলার ইংলিশবাজার, কালিয়াচক, পুরাতন মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে মুদিখানার দোকান, পানের দোকান, টেলিফোন বুথে বাংলাদেশী সিমগুলি পরিচয়পত্র ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি মালদা জেলার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ধৃত অনুপ্রবেশকারী ও গো-পাচারকারীদের কাছ থেকে সিমকার্ড পাওয়া গেছে। বি এস এফের মালদার সিনিয়র কম্যান্ড্যান্ট ললিত কুমার এক্কা জানিয়েছেন, বেআইনি সিমকার্ডের চক্র ধরতে তাঁরা জওয়ানদের সতর্ক করে দিয়েছেন। এছাড়া কিছুদিন আগে বি জি বি-এর (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বি এস এফের গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে ৩০০-৪০০ টাকায় বাংলাদেশি সিমকার্ড অনায়াসে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মালদার পুলিশ সুপার জয়ন্ত

পাল বলেন, আমরা সীমান্তের বিভিন্ন গ্রামের পানের দোকানে ও মুদিখানাগুলিতে এবং টেলিফোন বুথগুলিতে বাংলাদেশী সিমের ব্যবহার রুখতে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং নজরদারি বাড়িয়েছি। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশী সিম কার্ডগুলি ভারতের মাটিতে ব্যবহৃত হলেও তাতে কথোপকথনের কোনও খবর— পুলিশ বা গোয়েন্দারা কিছুই পাচ্ছেন না। মালদা জেলার কালিয়াচকের শ্মশানী, মিলিক, সুলতানপুর, মহবতপুর, সুকদেবপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী, সূতী, ধূলিয়ান ও ফরাক্কাতে বাংলাদেশী সিমকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব সীমান্ত এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের মোবাইলের নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। সীমান্ত এলাকার বহু আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশে থাকেন। তাছাড়া অনেক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মাদ্রাসাতে পড়তে এপারে সিমকার্ড নিয়ে চলে আসছে। মাদ্রাসাতে পড়াশুনা করার পর খুব সহজেই ভারতীয় হিসাবে পরিচয়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মোবাইলের সিম থেকে বাংলাদেশে কথা বলতে বেশী খরচ হয়। কিন্তু বাংলাদেশী সিমে খরচ অনেক কম। সেই জন্যই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে খরচ বাঁচানোর জন্য সিমকার্ডগুলি সংগ্রহ করছে ও লুকিয়ে রাখছে। স্থানীয় যুবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা সংগ্রহ করছে এবং ঘরে বসেই এস এম এসের মাধ্যমে 'ব্যালেন্স' পেয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে মাদ্রাসাসহ সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে বাংলাদেশী 'সিম'-এর কারবার বন্ধ না করলে অপরাধের সংখ্যা, যেমন জাল নোটের কারবার, অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে না বা কমবে না। তেমনি এতে দেশের নিরাপত্তার দিক থেকেও ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা ৭.০০ টাকা।
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা (সডাক)।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করে
মাত্র দুই মিনিটে খৈ তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

জলের জন্য হাহাকার

মহারাষ্ট্রের ১৫টি জেলার ১০ হাজার গ্রাম খরার কবলে

সাখারে এক গ্রাম্য রমণী শুকনো দহরেজা নদী থেকে জল তোলার অমানুষিক প্রয়াসে রত।

বিশেষ প্রতিনিধি॥ সকাল ছটা থেকে সাতাশ বছরের গৃহবধূ মালতি পালভি এক পাত্র জলের জন্যে সারবন্দি দাঁড়িয়েছিল কুয়োর ধারে। আট ঘণ্টা বাদে বেলা দুটোয় তার জল নেওয়ার পালা এলো। ছবিটা মহারাষ্ট্রের। মুম্বাই নগরী থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে থানে জেলার সাখারে গ্রামের এই রকম জলসংকট চিত্র এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। তীব্র খরায় ক্লিষ্ট মানুষ জলের জন্যে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে। একশো জনের বেশি মহিলা দাঁড়িয়েছিল মালতির আগে একপাত্র জলের জন্যে। এতেই বোঝা যাচ্ছে সাখারের চিত্র কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যের ৩৫টি জেলার মধ্যে কমপক্ষে পনেরোটি ভয়ঙ্কর জলসংকটের মুখোমুখি হয়েছে। রাজ্যের জল সরবরাহ মন্ত্রী লক্ষ্মণ ধোবালে স্বীকার করেছেন, ১৯৭১ সালের পর রাজ্যে এরকম খরা দেখা দিয়েছে।

গত বছর খরাকবলিত কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাত ভালোই হয়েছিল। সরকারি হিসেবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে থানে, সোলাপুর, সাংলি, পরবানি, হিন্দোলি, ওয়াশিম, ইয়তমল। এছাড়া ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃষ্টি হয়েছিল নাসিক, ডুলে, নন্দরবার, ঔরঙ্গবাদ, জালনা, ওসমানাবাদ, নান্দের, অমরাবতী, ওয়ার্ধা, নাগপুর জেলায়।

মহারাষ্ট্রের জল সরবরাহ মন্ত্রীর দপ্তরের সমীক্ষা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, রাজ্যের প্রায় দশ হাজার গ্রামে ভয়ঙ্কর জলসংকট দেখা দিয়েছে। কয়েকটি জেলা সদরে জল সরবরাহে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। দু'দিনে একদিন জল যাচ্ছে সেখানে। আকোলা ও বুলধানা জেলার গ্রামীণ মানুষদের দূষিত জল পান ছাড়া কোনও উপায় থাকছে না।

ওয়াশিম জেলার দশটি গ্রামের মানুষ নিজেদের বাড়ির শৌচালয় ব্যবহার বন্ধ করেছে জলের অভাবে। থানে জেলার অবস্থাও করুণ। মানুষের মলমূত্র স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা অসহায় একথা বললেন বিক্রমগড় গ্রামের বাসিন্দা জিভা ওয়াঘেরা।

জলাভাবের দরুন জল নিয়ে ঝগড়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এক মহিলা পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন থানে জেলার মোখাদা গ্রামে। সাহাপুর ও তার আশপাশের এলাকার অধিবাসীরা অভিযোগ করছেন, রাজনীতিওয়ালারা জল ছিনতাই করছে। 'সাহাপুরে চারটে বড় জলাধার আছে। কিন্তু সেই বাঁধের জল যাচ্ছে মুম্বাইতে। আমাদের শুকিয়ে জলশূন্য রেখে।' বললেন গ্রামবাসী মহাদেব ভাজশালী।

কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকার অপেক্ষা করে দেখার নীতি নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের এখনও দ্বিধা খরা ঘোষণা করায়। কিন্তু রাজস্ব বিভাগ অনুমান করছে খরায় শস্যহানি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রশাসনকে, জল সরবরাহ গাড়ি বাড়িয়ে দেড় হাজার করার জন্যে। তিনি বলেছেন, 'জল সংকট চিন্তাজনক। আমরা খুব সতর্ক হয়ে পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি।' উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ঘোষণা করেছেন, পশ্চিম মহারাষ্ট্রের খরাকবলিত এলাকায় চাষীদের হেক্টর পিছু ৮ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। ওই অঞ্চলে তাঁর জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলের (এন সি পি) প্রভাব বেশি। রাজ্য সরকারের পাওনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২,৭০০ কোটি টাকা।

রাজ্যের বিধান পরিষদের বিরোধী নেতা বিনোদ তাওদি বলেছেন, 'সরকার খরা পরিস্থিতি নিয়ে আন্তরিকভাবে কিছু ভাবছে না।' তিনি চারদিন ধরে ঘুরে এসেছেন সাতারা ও সাংলি জেলার খরা অঞ্চলগুলি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীও ২৮ এপিল সাতারায় ঘুরে এসেছেন।

ভোট এখনও দু'বছর বাদে ২০১৪ সালে। সেজন্যেই বোধহয় রাজনীতিওয়ালারা খরার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয়।

‘চাষা’র ছেলের আই আই টি জয়

সত্যম কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিদ্ধান্ত সিং কখনও পাঠশালার মুখ দেখেননি। সিদ্ধান্ত-পত্নী প্রমীলাও তাই। চাষ-বাসেই দিন কাটে। সম্পন্ন কৃষক এমনটা বলবার জো নেই। তবে অস্বচ্ছল অবস্থাতেও হাসি-মুখে দিন কেটে যাওয়ায় অভাবটা টের পাওয়া যায় না। এহেন ‘অশিক্ষিত’ বাবা-মায়ের সন্তান সত্যম কুমার সম্প্রতি যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাতে সিদ্ধান্ত-প্রমীলার প্রকৃত সুখের দিন দেখা যে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা একথা হলফ করেই বলা যায়। সদ্য-প্রকাশিত আই আই টি জয়েন্টে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সত্যম। শুনে নাক কোঁচকাবেন না। বলে বসবেন না এরকম তো কতই হয়! জিজ্ঞেস করবেন না র‍্যাঙ্ক কত। কারণ সত্যমকে এসবের উর্ধ্বে রাখাই ভাল।

একটা বারো বছরের ছেলের ওপর আর কত চাপ দেওয়া যায় বলুন দিকি! না, শুনে মোটেও আশ্চর্য হবেন না। আই আই টি-র মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষায় রেকর্ড গড়ে ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই লেখা-পড়ার চর্চাহীন কৃষক পরিবারে জন্মানো সত্যম কুমার সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ২০১০-এ দিল্লীর মহাল কৌশিক এতদিন পর্যন্ত সবচেয়ে কম বয়সী (১৪) হিসেবে আই আই টি-র যোগ্যতা অর্জনকারী ছিল। তবে এতসবের মধ্যেও কাঁটার মতো খচখচ করছে আই আই টি জয়েন্টে তার র‍্যাঙ্কটি। বিহারের ভোজপুর জেলার বাখরপুর নিবাসী সত্যম কুমার মুম্বাই জোন থেকে ১৮৩৭ র‍্যাঙ্কে স্থান পেয়েছে। একদিক দিয়ে এই ফলাফল যথেষ্ট ভালো, কারণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪.৮ লক্ষ। অবশ্য তার র‍্যাঙ্ক যে আশানুরূপ হয়নি এটা বুঝতে পেরেছে সত্যমও। সত্যমের স্বপ্ন, বড় হয়ে নিজের সফটওয়্যার কোম্পানী খুলবে। তাই ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার জন্য আগামীবার ফের আই আই টি জয়েন্টে বসার মনোবাসনার কথা জানিয়েছে সে। কারণ এই র‍্যাঙ্কে আর যাই হোক, ভাল কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জোটার সম্ভাবনা নেই।

অন্য রকম

ক্লাস নাইন পর্যন্ত পাটনার সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনো সত্যম কুমারের। এরপর সে চলে যায় কোটায়। আই আই টি প্রবেশিকার কোচিং হাব হিসেবে যে শহরের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। কোটায় সেরকমই একটি কোচিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয় সে। স্কুলের ডিরেক্টর আর কে ভার্মা স্বয়ং আই আই টি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির তত্ত্বাবধান করেন, এমনকী অর্থসাহায্যও করেন। সত্যমের এই সাফল্যে আর কে ভার্মার অবদান তাই ভোলার নয়। কোটার একটি স্কুল থেকেই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয় সে। সত্যমের এই অভাবনীয় সাফল্যে স্বভাবতই খুশির ঢেউ খেলে গিয়েছে তার গ্রামে।

এই সাফল্য শুধু সত্যমের বাবা-মা মানে সিদ্ধান্ত- প্রমীলাকে নয়, গর্বিত করেছে গোটা গ্রামকেই। ভারতের লক্ষাধিক গ্রামে এক-আধটা করে সত্যম যে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা নয় তবে খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতাটা কিন্তু আমাদেরই।

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি কনৌজের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অধীনস্থ সাকেত মণ্ডলের অধীশ্বর মেঘসূত অযোধ্যাতে একটি সুদৃশ্য স্বর্ণচূড়াযুক্ত বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। বর্বর বাবরের নির্দেশে সেনাপতি মীর বাকী এই মন্দির ধ্বংস করে। সেই মন্দিরের মালমশলা নিয়েই নির্মাণ করে বাবরী মসজিদ।
এলাবাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ মামলায় লুঙ্গি পূজক মার্কসগ্রস্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইরফান হাবিবের সঙ্কেতে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের হয়ে চাকরের মতো মিথ্যা ও পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য দেয়। সেই ইতিহাস নিয়েই
রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের
রামজন্মভূমি-বাবরী মসজিদ মামলা
বাম শঠতার বৃত্তান্ত, ১৭০
তুহিনা প্রকাশনী।। ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। মো-৯৮৩০৫৩২৮৫৮।।
দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। মো-৯১৪৩৩৭৪০২৬।।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

অগ্নিপুরানের কোলাজ

পুস্তক প্রসঙ্গ

নবকুমার ভট্টাচার্য

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ অষ্টমপুরাণরূপে অভিহিত। সাধারণতঃ অষ্টাদশ পুরাণকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যে সকল পুরাণে প্রধানভাবে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে সাত্ত্বিক, যাতে প্রধানভাবে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে তাকে রাজসিক এবং যাতে প্রধানভাবে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তাকে তামস পুরাণরূপে অভিহিত করা হয়েছে। সে অর্থে অগ্নিপুরাণ তামস পুরাণ। এই পুরাণে মানুষের জীবনের কথা রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলি এই পুরাণে স্থান পেয়েছে। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত বিষয়াবলীর জন্যই অন্য সকল পুরাণ থেকে বিশেষত্বের দাবি করতে পারে। অগ্নিপুরাণ বিদ্যার্থীকে বিদ্যা, কর্মকুশলীকে ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণতা এবং মুমুক্ষু সাধককে মোক্ষদানে সক্ষম। যদিও মোক্ষ স্বরূপতঃ নিত্য। 'নিত্য' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনও কোনও বস্তু আছে যেগুলি পরিবর্তনশীল তবু যেহেতু সেই বস্তুগুলির অনিত্যতা সম্পর্কে আমরা কখনই অসুবিধার সম্মুখীন হই না, তাই ওই বস্তুগুলিকে নিত্য বলে অভিহিত করা হয়। যেমন পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী জল ইত্যাদিকে নিত্য বলা হয়। আচার্য শঙ্করের মতে মোক্ষ সর্বপ্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। মোক্ষ হলো অপরিণামী, মহাকাশের মতো সর্বব্যাপী। মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ধর্ম ও অধর্মের ফলের কোনও স্থান নেই। মোক্ষ হলো স্বয়ং জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ চৈতন্য বা শাশ্বত। অগ্নি পুরাণে ধর্ম অর্থ কামের সঙ্গে মোক্ষলাভের বলিষ্ঠ বিন্যাস রয়েছে। আমাদের পুরাণের সংখ্যা অনেক কিন্তু সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হলো রামায়ণ ও মহাভারত।

আমাদের সমাজজীবনে এই দুটি গ্রন্থের প্রভাবই সর্বাধিক। বিশেষত আমাদের প্রবাদ রামায়ণ এবং মহাভারতের নানা চরিত্র এবং ঘটনার রাজকীয় সমাবেশ লক্ষ্য করার মতো। রামচন্দ্র আমাদের কাছে আদর্শ ব্যক্তিরূপে গৃহীত। অগ্নিপুরাণেও রামায়ণ ও মহাভারত বাদ পড়েনি।

পরানুবাদ ও পরাণুকরণের জন্ম হয় হীনমন্যতার অন্ধকার থেকে। এই হীনমন্যতা আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। আমাদের এই আত্মবিশ্বাস বা আত্মজ্ঞানের অভাব সকল দুঃখ দুরবস্থার মূলে। পররাজ্য লুণ্ঠনকারী

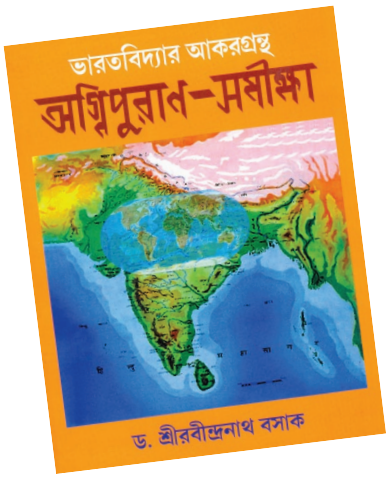

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের পদতলে পিষ্ট হয়ে শাসনের নামে শোষণের অভিশাপে গ্রস্ত হয়ে আমরা হারিয়ে ফেলেছি এই আত্মবিশ্বাস। আমরা জানি না আমাদের অতীত ইতিহাস। কী মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে আমাদের কাব্য সাহিত্যে পুরাণে তা আমাদের অজ্ঞাত। সংস্কৃত না জানার ফলে হারিয়ে গেছে বৃক্ষায়ুর্বেদ, গজচিকিৎসা, অশ্বচিকিৎসার পুঁথিগুলি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই উচ্চারণ করেছিলেন, 'অতীতকে জানা চাই। অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, অতীতের দিকে তাকাও, পেছনে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণভরে আকণ্ঠ তার জল পান কর, তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যত উঁচু গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল তাকে তার চেয়েও আরও উঁচু উজ্জ্বল মহৎ ও মহিমান্বিত করার চেষ্টা কর।' আমাদের অতীত প্রসঙ্গে জাতির উদ্দেশে স্বামীজী এরকম আরও অনেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত অতীত আমরা ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছি আধুনিক আঁতেল হয়ে উঠবার অন্ধ উদগ্র নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে। পরিত্যাগ করেছি আমাদের ঐতিহ্যকে সংস্কৃতিকে। কারিগরী বিদ্যাসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসন দিয়েছি আমরা সংস্কৃত ভাষাকে— সংস্কৃত সাহিত্যকে। অথচ আমাদের পূর্বজেরা সুদূর অতীতে সুদৃঢ় একটি জাতীয় সংহতি— কত সহজে তাঁরা অর্জন করেছিলেন এবং এই ঐক্যবোধ ও সংহতিচেতনা কত অনায়াসে আসমুদ্র হিমাচল প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এবং এসবই সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। ড. রবীন্দ্রনাথ বসাক অগ্নিপুরাণের প্রেক্ষাপটে এই অতীত ইতিহাসকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এজন্য তিনি বলেছেন 'যা নেই অগ্নিপুরাণে তা নেই অন্যপুরাণে'। অগ্নিপুরাণে জীবনচর্চার প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে এবং তাঁর বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছেন গ্রন্থকার। অগ্নিপুরাণ নিয়ে এত বিস্তৃত গবেষণা সম্ভবত এই প্রথম। জনগণ পুরাণে আগ্রহান্বিত হলে তবেই পুরাণ রক্ষা পাবে। ড. রবীন্দ্রনাথ বসাক ভগীরথ হয়ে অগ্নিপুরাণকে রক্ষা করার কর্তব্য পালন করেছেন। বইটি পরিপূর্ণ, তবে বইয়ের শেষে একটি নির্দেশিকা থাকলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোত। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অগ্নিপুরাণ সমীক্ষা।
ড. রবীন্দ্রনাথ বসাক।
সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬।
দাম : ৩০০ টাকা।

বেরসিক গোমড়ামুখেও অবলীলায় হাসি ফোটাতে পারে কার্টুন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে ৬৩ বছর আগে ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতার পরে পরেই দেশের সংবিধান রচনার কাজ চলছিল। সকলেই জানেন আমাদের সংবিধানের মুখ্য রূপকার বাবাসাহেব বি আর আম্বেদকর। সেই সময় ব্যঙ্গচিত্রী শঙ্কর পিল্লাই যিনি শঙ্কর নামে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ লাভ করেন, তিনি একটি মজাদার তথাকথিত কার্টুন

বা ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। ছবিটিতে দেখা যায় আম্বেদকর সাহেব একটি শামুকের (গায়ে লেখা সংবিধান) ওপর বসে সেটিকে দ্রুত যাওয়ার জন্য চাবুক হাঁকড়াচ্ছেন। আবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পক্ষান্তরে শামুক-সওয়ারী আম্বেদকারকে চাবুক হাঁকড়াচ্ছেন। বাস্তবে চাবুক না শামুকের না আম্বেদকরের কারোর শরীর স্পর্শ করেনি। কিন্তু এই নিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি লোকসভা তোলপাড় হয়ে যায়। এমন ব্যঙ্গচিত্রে দলিতদের অপমান করা হয়েছে ধরে নিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর পদত্যাগ পর্যন্ত দাবী করা হয়। মনে রাখতে হবে এই কার্টুন ৬৩ বছর আগে প্রথম ছাপা হলেও তখন কোনও প্রতিবাদ হয়নি। কার্টুনের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্বেদকরও তা দেখে গেছেন। সে যাই হোক, ফলশ্রুতিতে দলিত ভোটভীতি ও আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সরকার— এমনধারা আরও যে সমস্ত কার্টুন সরকার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে এতদিন নিরুপদ্রবে চলে আসছিল তা একলপ্তে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন এন সি ই আর টি-র (যাঁরা কার্টুনগুলিকে ছাপাবার অনুমোদন দিয়েছিলেন) দুই কর্তা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গেরই একটি আধা মফস্বল শহরের চায়ের দোকানের চাপান-উতোর কান পেতেছিলাম। মূলতঃ চারজনের কথোপকথনই বেশি গরমা-গরম ছিল। তাঁরা হলেন (১) নিবারণদা, স্থানীয় স্কুলের পঞ্চাশোর্ধ ইতিহাসের মাস্টারমশাই (২) সমীরণ, রাজধানী দিল্লীতে কর্মরত কেরাণী (৩) গোবিন্দ, বামমার্গী বেকার এবং (৪) কালু গায়েন, নিরক্ষর কৃষিজীবী।

নিবারণ— হ্যাঁরে শুনলুম মজার কার্টুন নিয়ে খুব গোল বেঁধে গেছে। কে কাকে চাবুক মারছে? দ্যাখ, আমরা তো ছাত্র বয়স থেকেই কতরকম কার্টুন কাগজে দেখতুম। তখন তো এত টিভি ছিল না, সকালবেলাটা বেশ মজাদার লাগত। জানিস একবার একটা বিখ্যাত কাগজের কার্টুন আজও আমার মনে পড়ে। সেই '৬০-এর দশকের শেষদিক। এখানে তখন সদ্য যুক্তফ্রন্ট হওয়ার পর খুব ডামাডোল, দল ভাঙাভাঙি, রাজনৈতিক অবিশ্বাস চরমে। সে সময় তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপারে খুবই সন্দিহান। রোজই দলবদল হচ্ছে, সবাই এদিক-ওদিক করে শাঁসালো মন্ত্রিত্ব পেতে চায়। সরকারের অবস্থা টালমাটাল। যে কোনও সময় বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দিতে হতে পারে। এমন সময় জ্যোতিবাবু কি কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে রোগশয্যায় শোয়া জ্যোতিবাবুকে জনৈক ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কষ্টটা কি বলুনতো? জ্যোতিবাবু বলছেন, রাত্রিতে ঘুমোতে পারি না, খালি মনে হয় পড়ে যাচ্ছি, এই বুঝি পড়ে গেলুম। আতঙ্কিত জ্যোতিবাবু ও হতভম্ব ডাক্তারের যে ব্যাঙ্গাত্মক ছবিটি ছাপা হয়েছিল তার নির্মল আনন্দরস আজও মনে অমলিন।

গোবিন্দ—মানলুম নিবারণ কাকা, তবে জ্যোতিবাবুর মহানুভবতা দেখুন, উনি কোনও প্রতিবাদ তো করেননি! এখন দেখুন কে এক অধ্যাপক আজকের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি নিয়ে কি এক ফোটো ছেড়ে জেলে কাটিয়ে এলেন।

নিবা— দ্যাখ, কার্টুন আর চরিত্র হননের মধ্যে কিন্তু সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম। কার্টুনশিল্পীকে কিন্তু খুব পা মেপে কাজ করতে হয়। লক্ষ্য করলে দেখবি কার্টুনের মুখ্য চরিত্রগুলোর মুখের মধ্যেও কিন্তু একটা অতি মানবিক ছোঁয়া থেকে যায়। অনেক সময়ই লিলিপুটের মতো ছোট কিংবা এমন বিশালাকার বা ভাঙ্গাচোরাভাবে আঁকা হয় যাতে ভাল আদল থাকে। ঠিক মুখের ফটো-কপি মনে হয় না। তো এই সব ব্যাপারগুলো আছে। তোকে তোর ঘোষিত পিতৃভূমি রাশিয়ার ঠিক কার্টুন না হলেও কার্টুনের থেকেও দ্বিগুণ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল এমন

একটা ছবির কথা বলি। একবার প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন এক শুয়োরের খামার উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তো নানান ফোটো-টটো উঠবে। সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে কড়া বার্তা গেল, দেখবেন শুয়োর কথাটা ছবিতে যেন কখনওই লেখা না হয়। ফাঁপরে পড়লেন সম্পাদক। অনেক মাথা ঘামিয়ে অন্যান্য পদাধিকারী ও শুয়োরের পালের মধ্যে দাঁড়ানো স্টালিনকে চিহ্নিত করতে ছবির তলায় লিখলেন ''বাঁ দিক থেকে চতুর্থ''। বোঝ ঠেলা!

সমীরণ— তোমার প্রথম কথাটা একদম ঠিক নিবারণদা। কার্টুনিস্টদের খুব মেপে পা ফেলতে হয়। আমি তো এখানে আসার আগে দিল্লীতে শুনছিলুম, অনেককে চাকরি পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছে বা পালাতে হয়েছিল। যেমন ধর দিল্লীর এক নামকরা কার্টুনিস্টের বাড়িতে রাত দুপুরে ফোন বাজতে শুরু করল। আতঙ্কিত শ্রোতা। ওদিক থেকে ভারি গলায় তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেদিনের কাগজের কার্টুনের মানে কি? নৈশ ফোনগুলি নাগাড়ে এসেই চলেছিল। সময়টা জরুরি অবস্থা চলাকালীন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটাচ্ছেন। কার্টুনে ছিল তখনকার নামজাদা মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁরা সারা মুখে কালো রঙ।

কার্টুনেই রয়েছে ভেতরে শ্রীমতী গান্ধী কালো রঙ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। বাইরের গেট থেকে চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে অন্যান্য তৎকালীন মন্ত্রীরা বিদ্যাচরণের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফোনকর্তার ভয় গেটের বাইরে তাঁর মুখাবয়ব আঁকা হবে কিনা। আবার দেখ, ওই সময়েই বিশ্বখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রী আর কে লক্ষ্মণ উঁচু হাই হিল জুতো পরা গর্বোন্নত এক মহিলার কার্টুন আঁকায় সেটিকে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিরূপ বলেই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলো। পরিণামে লক্ষ্মণকে বলা হয় নিজেকে সংশোধন করতে নয়ত ফল ভাল হবে না। এমন সরাসরি প্রেস সেনসরশিপ ও ব্যক্তিগত ভীতি প্রদর্শনে লক্ষ্মণ এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি পত্রপাঠ সস্ত্রীক মরিশাস চলে যান। গুরুবল, মাসাধিককাল পরে ফিরে আসার সময় জনতাদল শাসনক্ষমতায় চলে এসেছিল।

নিবা--- দ্যাখ তুই ঠিকই বলেছিস, রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র কিছুটা হলেও শাসকশ্রেণীর মধ্যে কার্টুনিস্টের বিপক্ষে শত্রু তৈরি করেই। আমি তো আগের কথাই বেশি মনে রাখতে পারি। তাই ধর না '৯৪-'৯৫ সালে লক্ষ্ণৌ-এর এক ব্যঙ্গচিত্রী, তখনকার মুলায়মের ওপর একটু উলটো-সিধে ছবি এঁকেছিল। মুলায়মের বাহুবলীরা মৃত্যু-ধমক দেওয়ার পর বেচারা চাকরি ছেড়ে দিল্লী গিয়ে অন্য কাগজে কাজ জোটায়। তবে হ্যাঁ, ওই যে বললুম সূক্ষ্ম সীমারেখা। গত লোকসভা ভোটের আগে এখানে ক্ষ্যাপা শাসকদল বিরোধী নেত্রীর কার্টুনে দেখাল লোল জিহ্বা, করালবদনী। তলায় লেখা ''শিল্প হলে ফুটবে হাসি, বুঝবি কবে সর্বনাশী''। এগুলি রসহীন বিযোদ্গার! অনেকটাই সেই সীমারেখা টপকানো। হিট বিলো দি বেল্ট।

গোবিন্দ— না একথা বলা ঠিক নয়, আমরা কার্টুন করলেই খারাপ ওরা করলেই ভাল এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো কথা হয়ে গেল।

নিবা— না রে পাগল, এতকাল স্বাধীনতার ৬৫ বছর লক্ষ লক্ষ কার্টুন বেরিয়েছে। লোকে দেখেছে, মজা পেয়েছে। নিজেদের সাধ্যমত মানে করেছে। এসব তো এই প্রতিক্রিয়াশীল আমলেই। তোর পিতৃকূল চীন, রাশিয়ায় কি হয়? লোকসভায় গিয়ে খুল্লামখুল্লা মন্ত্রীর কার্টুন বাজেয়াপ্ত করার মতো এমন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া নজিরবিহীন। আসলে কি জানিস, তোরা তো আবার আন্তর্জাতিক, তোদের মাথায় ঢোকানো মুশকিল। সবই এক ছাঁচে ঢালা। ভারতের মতো ধর্মময় দেশে যেখানে নানা জাতি, নানা ধর্ম, আচার, ব্যবহার, সেখানে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে গেলে সাধু সাবধান। কখন কোথায় কার খোঁচা লেগে যাবে তা আবহাওয়ার মতোই খামখেয়ালী। তবে হ্যাঁ, দলিত আর সংখ্যালঘু এই দুই নতুন বউ সম্পর্কে ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে। এরা সদা সন্তান সম্ভবা। গর্ভে থোকা থোকা ভোট।

সমীরণ--- দাদা, তুমি এখানে কালী-ঠাকুরের কার্টুনের কথা তুললে। তবে আমাদের একেবারে বরাবরের চেনা চণ্ডী লাহিড়ীর অসাধারণ রসগ্রাহী ব্যঙ্গচিত্রগুলোর কথাও বল! সত্যি কথা বলতে কি এই ছবিগুলো দেখলে মুখের রেখায় আপনা আপনি যে একটা চকচকে পরিবর্তন আসে তা কিন্তু অনুভব করা যায়। কত বেরসিক, গোমড়ামুখেও যে উনি অবলীলায় হাসি ফোটাতে পারেন তা আর বলার নয়। অথচ এর মধ্যেও ছিদ্রান্বেষণে খামতি ছিল না। ১৯৬২-তে চৌ এন লাই ও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের একই দোলনায় দোলার কার্টুনটি নিয়ে লোকসভায় শোরগোল হয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু কাঙ্ক্ষিত ঔদার্য দেখাতে পারেননি। স্বয়ং চণ্ডীবাবুর পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

কালু— দেখ তোমাদের সব ভারি কথাই এতক্ষণ মন দিয়ে শুনলুম। তবে, নাম-ধাম কার্টুন কিনা জানি না, আমারও তিন কুড়ি বয়স হলো। লেখাপড়া তো কেউ শেখায়নি কিন্তু নেত্যদিনের কাগজে আগে বরাবর একটা করে ছবি দেখতুম। ফোটোয় দেখা নেতাদের সঙ্গে তাদের বেশ মিল ছিল। দেখে মনে হোত আমরা মুখ্যুরা মনে যা ভাবি এই ছবিতেও তো সেরকমই বলছে। এই লোকগুলোর সব কাজকর্ম ভাল নয়। তারা যে আমাদের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথাই ভাবে এতো আমরা জানি। ছবিগুলোও সেই মনের কথাই মজা করে সকলকে দেখাত। বোর লাগত। মনে হোত আমাদের হয়ে কেউ নিঃশব্দে প্রতিবাদ করছে। তবে আজকাল খুব একটা দেখি না। তোমরা যা বলছ তা সত্যি হলে তো চিত্তির। সবটাই ছিবড়ে হবে, কোনও রস নেই। ওদের পোয়া বারো!

সমীরণ : নারে; নারে। আশা আছে, কংগ্রেসের এন ডি তেওয়ারী তো কার অবৈধ বাবা হওয়ার দায়ে কিছুতেই ডি এন এ পরীক্ষা করতে দিচ্ছেন না। কোর্ট-কাছারীর একশেষ, একটা ইংরেজি কাগজ কার্টুন করেছিল— একদল ডাক্তার ঘরে রক্তপায়ী মশা ছেড়ে দিয়ে গোপনে নিদ্রিত তেওয়ারীর রক্তচোষা মশাদের রক্ত পরীক্ষা করে ডি এন এ-এর বিকল্প রাস্তা খুঁজছে।

নিবা— ঠিকই! সবাই পালাবে না। কেউ না কেউ তোর জন্য থাকবেই, বুঝলি? তবে শোন, এই ঘটনা ঘটার পর, আমি তো ইতিহাস পড়াই, অনেক নাড়াচাড়া করে একটা প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো ঘটনা পড়লুম। আমেরিকায় ১৮৭২ সালে টুইড বলে এক জন দুর্নীতিগ্রস্ত ডেমোক্রেটিক শাসকের ছবি এঁকেছিল টমাস নামট। সে ছিল হার্পার উইকলির এক নির্ভীক কার্টুনিস্ট। ছবিতে লোকে টুইডকে দেখিয়ে বলছে আমাদের টাকা এই চুরি করেছে। টুইড কার্টুনিস্ট নামটকে সঙ্গোপনে গিয়ে তৎকালীন দিনে ১ লক্ষ ডলার দিয়ে ইউরোপে পড়াশোনা করার লোভ দেখায়। নামট বলেছিলেন আমার অত পড়ার দরকার হবে না। আমার কার্টুন তো নিরক্ষরেরা দ্যাখে।

ব্যঙ্গচিত্র : রমাপ্রসাদ দত্ত

স্মরণে

প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

''ভালোবাসা, বাঁচায় শুধু ভালোবাসা''। —আজ থেকে ৫১ বছর আগে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর লেখার প্রথম পর্বে। ১৯৩৪ সালে পূর্ববঙ্গের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া আরম্ভ।

স্বাধীনতার আগে জুন মাসে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। চিৎপুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫২ সালে উত্তর কলকাতার সিটি কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়া শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকেই কাব্যচর্চায় তাঁর ছিলো বিশেষ অনুরাগ, বিডন স্ট্রিটের কাছে চৈতন্য লাইব্রেরিতে তাঁর ছিলো নিয়মিত যাতায়াত। সিটি কলেজে পড়াকালীন তিনি সংস্কৃতিমনস্ক একাধিক তরুণের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের সাহচর্যে তিনি নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করেন। গঠনকাল থেকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কবিতা লিখতে থাকেন। সুনীল-শক্তি-সন্দীপনের সঙ্গে তাঁকেও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অন্যতম কবি হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। প্রতিবছর বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে ৫০-৫২টা কবিতা প্রকাশিত হোত।

১৯৫৯ সালে জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) কলেজে বাংলার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। এর কিছু পরে পিরানদেল্লোর প্রথাবিরোধী নাটক 'সিক্স ক্যারেকটার্স ইন সার্চ অফ্ এ্যান অথর' পড়ার পর তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে কবিতা থেকে নাটকে চলে আসার প্রেরণা দেয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ''যদি একান্তভাবে নিজের কথাই বলি তবে এই যে কবিতা থেকে নাটকে সরে আসা, এ আমার শ্রেষ্ঠ আমিকে প্রকাশ করার দায়বদ্ধতা থেকে। ১৯৬৩ সাল নাগাদ আমি অনেক আধুনিক নাটক, বিদেশী নাটক পড়ে ফেলেছি। সেই সব নাটকে কি অসাধারণ বৈচিত্র্য! আমাদের সাহিত্যে সমস্ত নাটকই রিয়েলিজমের মধ্য দিয়ে চলত। আপাত বাস্তবতার নিরিখে একটা অন্য মাত্রার নাটক নিয়ে আসার কোনও লক্ষণ ছিলো না। অথচ বিদেশী নাটকগুলিতে কি অগাধ বৈচিত্র্য। নাটকের মধ্যেও কবিতার একটা প্রকাশের জায়গা আছে বলে মনে হলো। আমার স্থির বিশ্বাস হয় নাটক আর কবিতা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই বিশ্বাস থেকেই নাটক লেখা শুরু করি।''

ওঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক, 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হয় 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রে। এই সময় ওঁর নাটক সম্বন্ধে 'কিমিতিবাদ' শব্দের প্রয়োগ শুরু করেন সমালোচকরা। কিন্তু মোহিতবাবুর নিজের কথায়, ''কিমিতি শব্দটা অ্যাবসার্ড নাটকের বঙ্গীয় প্রতিশব্দ। একটা নাটক তখনই অ্যাবসার্ড হয়, যখন তার মধ্যে ফিলসফি অফ্ অ্যাবসার্ডিটি থাকে। কিন্তু আমার নাটকগুলোর মধ্যে তা ছিলো না।''

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' থেকে শুরু করে, 'ক্যাপ্টেন হুররা' হয়ে ১৯৭২-এ 'রাজরক্ত' এর প্রকাশ।

'রাজরক্ত' প্রসঙ্গে মোহিতবাবু নিজে বলেছেন, ''রাজরক্ত নাটক থেকে আমার নাটকে একটা অন্যরকম পর্যায় এসেছিলো। এই নাটকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও এক বিরুদ্ধ অপশক্তির সঙ্গে আমাদের লড়াই চলেছে।''

এই সময়ে এসে মোহিত নিজে উপলব্ধি করেন, তাঁর প্রথম দিককার নাটকে মানবজীবনের অন্তর্গত জগতকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ততটা সমাজ ও সমকালের রাজনীতিকে ধরা হয়নি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটকে প্রকাশ পেল তার রাজনৈতিক ও সামাজিক বোধ। তাঁর নাটক লেখা প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেন, ''কথা বলার মতো করে নয়, কথাটা পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই একজন নাট্যকারের শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় ঘটে। যখন আমি নাটক লিখি ডিপার লেভেলকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা থাকে। হয়তো এই গাঢ়তার জন্য শব্দ চয়নের মধ্যে গাঢ়বদ্ধতা আসতে পারে। ভালো সংলাপ যদি লেখা হয় তাহলে অনেকে বলেন নাটকের সাহিত্যগুণ আছে। আমি কিন্তু একে নাট্যগুণ বলতে চাই। প্রত্যেক শিল্পই অন্যান্য শিল্পের কিছু দিককে ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া একজন নাট্যকার যখন নাটক লেখেন তখন তিনি সংলাপের জন্য জীবনের দ্বারস্থ হন। যে মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন, তার মধ্য থেকে তিনি সংলাপকে আহরণ করেন।''

মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হলো— নীলরঙের ঘোড়া (১৯৬৪), মেটামরফসিস (১৯৬৫), গন্ধরাজের হাততালি (১৯৬৬), মৃত্যুসংবাদ (১৯৬৫), মহাকালীর বাচ্চা (১৯৭৮), মুষ্ঠীযোগ (১৯৯৪), হারুণ অল রশিদ (১৯৯৯) এবং সক্রেটিস (২০০৮) ইত্যাদি।

২০১১ সালে দুরারোগ্য কর্কটরোগ তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি কথা বলার শক্তি হারান। অথচ তিনি বরাবর কথা বলতে, আড্ডা মারতে ভালোবাসতেন। শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু রয়ে গেল তাঁর কয়েকটা বাক্য— ''হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা আমার ভালো লাগে না। তাই আমি নাটক লেখার ক্ষেত্রে, হতাশা আর গ্লানি কাটিয়ে মানুষকে জাগ্রত করার ক্ষেত্র তৈরী করছি।'' নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতা-নাটকে, সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী নাট্যকর্মী এবং নাট্যানুরাগীদের হৃদয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির স্মারকপত্র।
২. গ্রুপথিয়েটার, প্রথম সংখ্যা ২০০৯।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা-সভা নন্দনে

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সম্প্রতি নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 'এখন সত্যজিৎ' সংস্থার আয়োজনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল— সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র।

বিখ্যাত অভিনেতা বরুণ চন্দ ছিলেন সভার সঞ্চালক। তিনি প্রথমে বলেন, সত্যজিতের

চারুলতায় 'চারু' মাধবী মুখোপাধ্যায়।

ছবির গল্প প্রবাহ এবং বিভিন্ন চরিত্রের 'ফিজিকাল ড্রামা' উল্লেখযোগ্য। নারীচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেউ এত ভালোভাবে উন্মোচিত করতে পারেননি। এরপর উনি প্রথম প্রশ্ন করেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়কে। প্রশ্নটি ছিল— আপনার প্রথম নারীপ্রধান চরিত্রে অভিনয় কোনটি এবং তা করে কেমন লেগেছে?

মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, আমার নায়িকাপ্রধান প্রথম ছবি, 'মহানগর'। নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়িতে যে সব ঘটনা ঘটে তা সবই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। আমাদের সমাজে স্ত্রীরা সবসময় স্বামীকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু স্ত্রীরা বেশি এগিয়ে গেলে স্বামীরা পছন্দ করে না। এই ছবিতে আরতির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আরতির প্রথমে কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। আস্তে আস্তে তার নিজের একটা পরিচয় তৈরি হয়। এক সময় 'বস'-এর অবিচারের কারণে নারীজাতির আত্মসম্মানের কথা ভেবে আরতি চাকরিতে ইস্তফা দেয়। তখন কিন্তু তার স্বামী তাকে সমর্থন করে। আমি বলতে পারি সত্যজিতের ছবি বার বার দেখলে, এক এক বার এক এক রকমভাবে আবিষ্কৃত হয়।

এরপর বরুণবাবু বিশিষ্ট চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ শিলাদিত্যবাবুকে প্রশ্ন করেন, সত্যজিতের নারীপ্রধান ছবি কেন কম এবং নারীচরিত্রদের মধ্যে যে বিবর্তন দেখা যায় সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

শিলাদিত্যবাবু বলেন, সত্যজিৎ রায় নিজে বলেছেন, 'এরকম নয় যে নারীপ্রধান ছবি করতে চাই না। পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য পেলেও নারী চরিত্র স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত থাকে।'

তিনি মেয়েদের মধ্যে সর্বক্ষণ এক বিশেষ শক্তি লক্ষ্য করেছেন। যেমন, অপরাজিততে সর্বজয়ার চরিত্র। সে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু অপুকে কিছুতেই চিঠি লেখে না। এটা শুধু অভিমান নয়। যে ছেলে তার খোঁজ নেয় না তার প্রতি যেন একটা প্রতিবাদও। এটা একটা অভ্যন্তরীণ শক্তির উদাহরণ ভারতীয় নারীর সমাজে। চারুলতায়, এক ছাদের নীচে নষ্ট সম্পর্ক নিয়ে ভূপতির সঙ্গে থাকতে হবে জেনেও চারু চুপ করে থাকে। এই চুপ করে থাকাটা হার নয়। এই নীরবতা হচ্ছে অসম্মতির লক্ষণ। সব মেনে নিয়েও ভূপতির সঙ্গে থাকবে, এটা একটা আত্মশক্তির পরিচয়। ঠিক একইভাবে পোস্টমাস্টারের রতন মেয়েটি আবেগতাড়িত না হয়ে নীরব প্রত্যাখ্যান দেখিয়েছে। সত্যজিতের ছবিতে এই নীরব প্রত্যাখ্যান এবং নারীর ভিতরের শক্তির পরিচয় বার বার দেখা গেছে।

এরপর বরুণবাবু বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীকে, কোন নারীচরিত্র তাঁকে বেশী নাড়া দিয়েছে সে বিষয়ে বলতে বলেন। বিভাসবাবু বলেন, আমাকে সর্বজয়ার চরিত্র খুবই ছুঁয়ে গেছিল। নিজের মায়ের সঙ্গে যেন মিল পেতাম। রাঁধুনীর চাকরি নেওয়া সর্বজয়া যখন দেখতো, অপু বাবুদের কাজ করে দিয়ে পয়সা নিত সেটা সে মেনে নিতে পারেনি। তারপরই জিপ্ প্যান করে ট্রেন দেখানো হলো। অর্থাৎ তারা চলে যাচ্ছে। আমাদের সব মায়েরাই যেন এক একজন সর্বজয়া, যাঁরা নিজেদের জীবনে আত্মত্যাগ করে ছেলেকে এগিয়ে দিতে চান।

বিভাস চক্রবর্তীর পর বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সোমা. এ. চক্রবর্তী। তিনি বলেন, নিজেকে যেন মহানগরের আরতির সঙ্গে মেলাতে পারি। কিন্তু এও বলতে হয় যে সত্যজিতের ছবিতে বিভিন্ন বস্তুরও ব্যাপক প্রভাব আছে। যেমন মহানগরে অফিসের অ্যাংলো বান্ধবীর কাছ থেকে লিপস্টিক পায় আরতি। সে যেন এক নতুন উদ্দীপনাও পায়। আবার এই ভয়ও কাজ করে যে পরিবারের কেউ সেটা মেনে নেবে না। সে লুকিয়ে লিপস্টিক মাখে। পরবর্তী সময়ে লিপস্টিক ফেলে দিতে হলেও সেই বান্ধবীর স্মৃতি কিন্তু থেকে যায় আরতির অন্তরে। বিভিন্ন বস্তুর 'ডিটেল' ও তার প্রভাব খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় সত্যজিতের ছবিতে।

নারীচরিত্রের বিষয়ে শেষ প্রশ্ন ছিলো আরেক চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'অপরাজিতা'য় সর্বজয়া করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাছে। তিনি বলেন, ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর দৃশ্য ভুলতে পারি না। সত্যজিতের শিল্পীচোখের পরিচয় পাওয়া যায় এই দৃশ্যে। ওঁর বিভিন্ন ছবিতে নারীচরিত্র অপমানিত হয়েও স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে বাঁচতে চায়। পোস্টমাস্টারের রতন, চারুলতার চারু সবাই এর মধ্যে পড়ে। সত্যজিতের ছবির এ এক বিশেষত্ব।

সূর্যবাবুর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে। সভার পরে ছিলো 'সত্যজিৎ রায়' বিষয়ে 'ক্যুইজ'। এইরকম ভাবেই এক অনন্য মনোজ্ঞ সন্ধ্যা উপহার দিলেন 'এখন সত্যজিৎ' সংস্থাটি।

শব্দরূপ-৬২৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

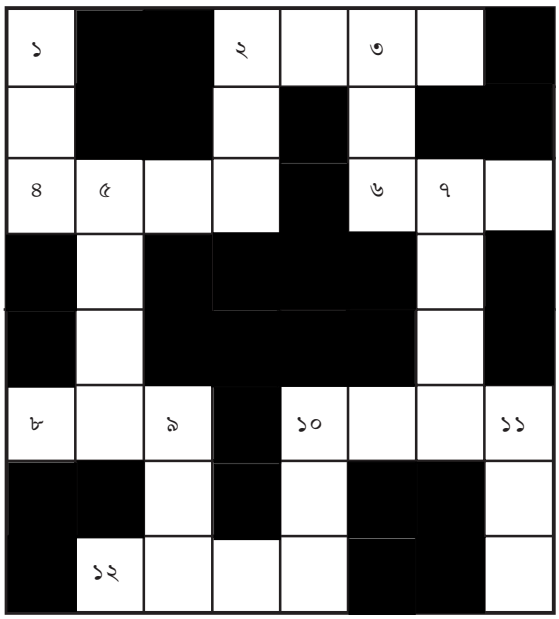

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. দুর্যোধনের আদরের নাম, ৪. রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ঘরের শত্রু, ৬. দুর্যোধনের মাতুল, ৮. নবপ্রসূতা, ১০. যাহাকে (যে নদনদীকে) সহজে পার হওয়া যায়, ১২. নীলপদ্ম।

উপর-নীচ : ১. 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা কবি, ২. রামায়ণে বানরদের মধ্যে ডাক্তার, ৩. মহাধনী, কুবের; বৃক্ষ-চঞ্চু পক্ষীবিশেষ, ৫. বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ, ৭. ভূমিসাৎ; পরাভূত, ৯. যমুনা, ১০. সুস্বাদ, ১১. গুঞ্জা, কুঁচ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		ত্র	কা	ম্র	কা	ন	ন
ব	লা	কা				দে	
ড়		ক্ষী	রি	কা		র	
বা	ঘ			ঞ্চী		চাঁ	
	র্ম		অ			দ	প
	চ		পু	ষ্প	ক		র
	র্চি				র	মে	শ
অ	কা	ল	কু	ষ্মা	ণ্ড		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬২৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ জুন, ২০১২ সংখ্যায়

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ২৫

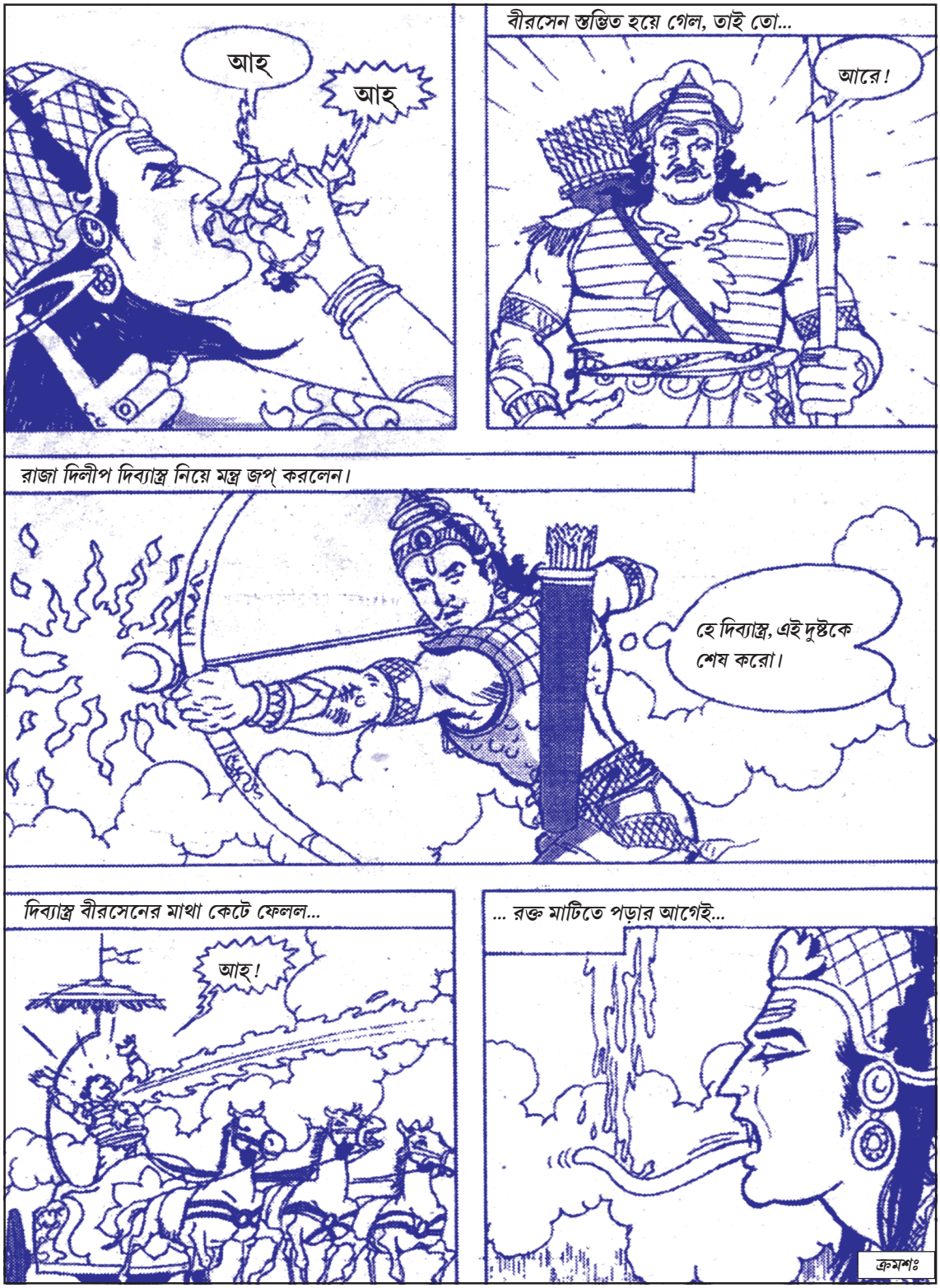

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ-শিক্ষাবর্গ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশভক্ত, চারিত্র্যসম্পন্ন সংগঠিত হিন্দুসমাজ-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষকে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য দীর্ঘ ৮৭ বছর যাবৎ কাজ করে চলেছে। যারা রাজনীতি করেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য সঙ্ঘকে দুর্নাম দেন, অপপ্রচার করেন। আর যাঁরা সঙ্ঘকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা সঙ্ঘকে ঠিকভাবে বুঝেছেন, তাঁরা সঙ্ঘ সম্বন্ধে প্রশস্তি করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন একদা প্রচণ্ড সঙ্ঘ বিরোধী প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আচার্য বিনোবা ভাবে প্রমুখ। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের সময় জওহরলাল নেহরু স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ দেশসেবায় এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, ১৯৬৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘকে যোগদানের আহ্বান জানান। এবং প্রায় দু’হাজার স্বয়ংসেবক সেই প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন।’’ উপরোক্ত বক্তব্য সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাসের। তিনি গত ২৬ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়ায় সারদা শিশুমন্দির সংলগ্ন ময়দানে দক্ষিণবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের প্রকাশ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি আরও বলেন, এদেশ হিন্দুস্থান, হিন্দুরাষ্ট্র। রাষ্ট্রে সর্বনিম্ন একক হলো ব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে চরিত্র, দেশভক্তি এবং সমর্পণের মনোভাব জাগানোর জন্যই সঙ্ঘ শাখা। উপস্থিত সকলে একাজে যুক্ত হোন।

গত ৬ মে থেকে এই বর্গ শুরু হয়। বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ১৪০ স্থান থেকে ১৯২ জন স্বয়ংসেবক শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলেন। এদিন শিক্ষার্থীরা লাঠিখেলা, যোগাসন, সূর্যনমস্কার, ব্যায়ামযোগ ও ঘোষ (Band) প্রদর্শন করে দেখান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা অবসরপ্রাপ্ত বি এস এফ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল দীপক কুমার চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, স্বয়ংসেবকরা দেশভক্ত সৈনিক। প্রত্যেককে নিজক্ষেত্রে গিয়ে সঙ্ঘের কাজ করতে হবে। যে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার হেডগেওয়ার তা পূর্ণ করতে হবে। বর্গের বিবরণ দেন বর্গ কার্যবাহ নরসিংহ ঘোষ।

মঞ্চে ক্ষেত্রসঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ অজিত প্রসাদ মহাপাত্র এবং বর্গাধিকারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। সব শেষে ধন্যবাদ জানান বর্গের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ তাপস ভট্টাচার্য।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে ভাষণরত দীপক চক্রবর্তী। এছাড়াও রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) অজিত মহাপাত্র, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বিশ্বাস ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বয়ংসেবকদের কসরৎ।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ জুন, ’১২

‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পুনরুত্থানের অন্যতম পুরোধাপুরুষ। একই সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক। বঙ্গসাহিত্য স্রোতধারার তিনি ভগীরথ। আবার শাসনের কঠিন কঠোর বাতাসে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণের ধূম ও ভস্মরাশিও নিবারিত করেছেন। তখন তিনি কঠোর সমালোচক, সম্পাদক। তাঁর একশ পঁচাত্তর বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধার্ঘ্য— বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা।

১৫ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
4 June - 2012

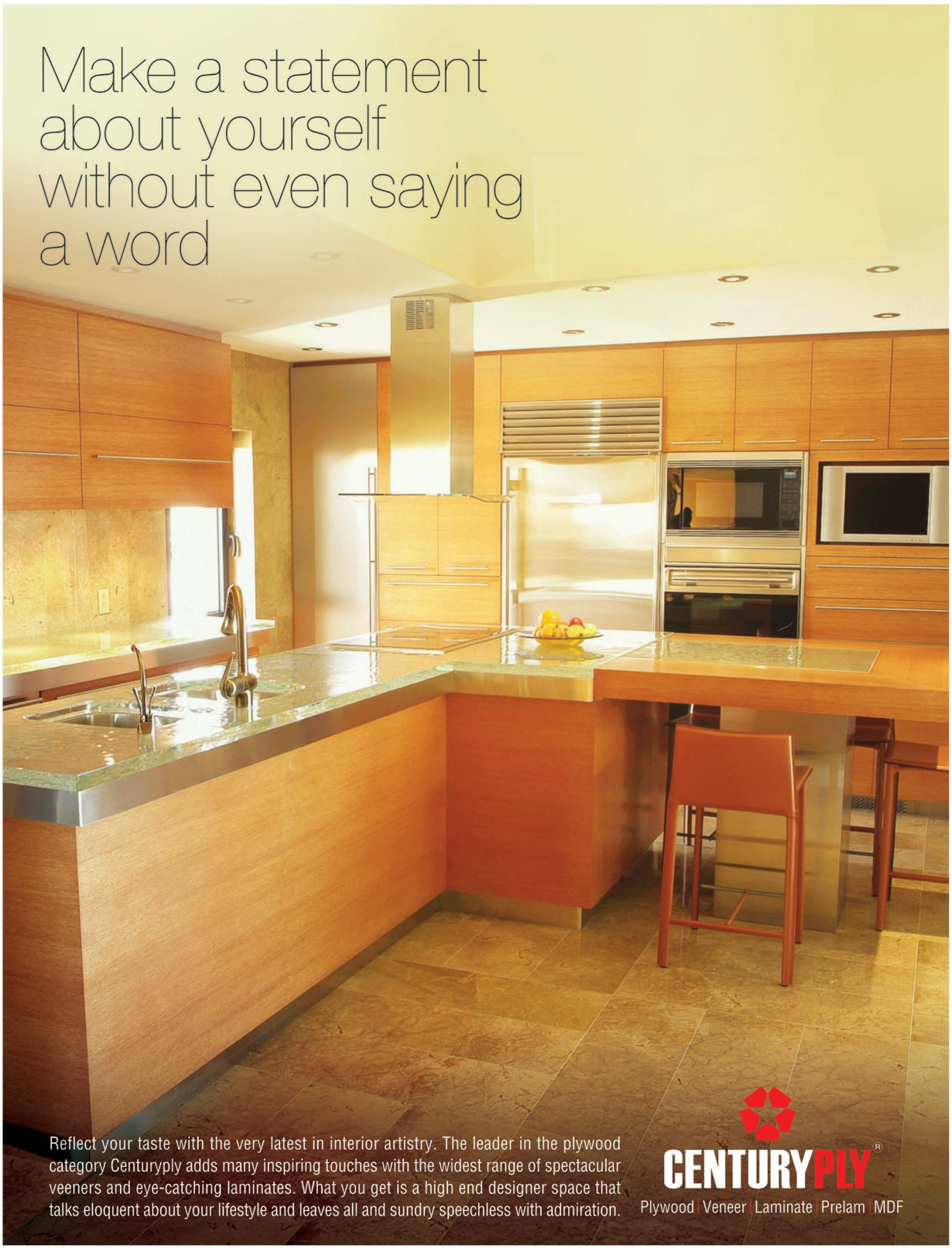

দাম : ৭.০০ টাকা